নভেম্বর
১৯৭৫
অগ্রহায়ণ
১৩৮২
সন্দেশ
সন্দেশ
ছোটদের সেরা মাসিকপত্র
সম্পাদক
লীলা মজুমদার
নলিনী দাশ • সত্যজিৎ রায়
গল্প · কবিতা · উপন্যাস · খেলাধুলা · বিজ্ঞান · চিঠিপত্র · ধাঁধা · প্রতিযোগিতা ইত্যাদি

পত্রিকাটি ধুলো খেলায় প্রকাশের জন্য

হার্ডকপি : শ্রুভাবতী চক্রবর্তী

স্ক্যান ও এডিট : সুজিত কুন্ডু

একটি আবেদন

আপনাদের কাছে যদি এরকমই কোনো পুরোনো আকর্ষণীয় পত্রিকা থাকে এবং আপনিও যদি আমাদের মতো এই মহান অভিযানের শরীক হতে চান, অনুগ্রহ করে নিচে দেওয়া ই-মেইল মারফত যোগাযোগ করুন।

e-mail : optifmcybertron@gmail.com; dhulokhela@gmail.com

সন্দেশ

ছোটদের সচিত্র মাসিকপত্র

লীলা মজুমদার, সত্যজিৎ রায় ও নলিনী দাশ সম্পাদিত

অগ্রহায়ণ | সূচীপত্র | ১৩৮২

ধূর্জটি প্রসাদ দত্ত—
কাঁদল বুঝি ঘুমের পরী ১
লীলা মজুমদার—মানসযাত্রা ২
অশোক মুখোপাধ্যায়—
মন্দাকিনীর কাণ্ড ৮
নোটুবিহারী চট্টোপাধ্যায়—মিল-গরমিল ৯
দেবাশীষ গুপ্ত চৌধুরী—
সেই বৃদ্ধ ভদ্রলোকটি ১০
সুবিনয় রায়—বোতলের যাদু ১১
অসিত বরণ হাজরা—ভাই ভাই ১৫
হাসিরাশি দেবী—বুদ্ধির উপদেশ ১৮
রেবন্ত গোস্বামী—কচি পাতার রঙ ১৯
জয়ন্ত দাশ গুপ্ত—তলায় তলায় ২৩
বারীন বসু—ছোট্ট ছড়া ২৬
বাণী রায়—ষাঁড়ের নেমন্তন্ন ২৭
অমৃতলাল পাঁজা—জলসার জ্বালা ২৯
চিঠিপত্র ৩০
হাত পাকাবার আসর ৩৪
জীবনকৃষ্ণ দাস—স্বর্ণ রেখার শয়তান ৪১
অনির্বাণ রায়—চটজলদী গপ্পো ৪৬
মলয় কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়—
কোন সুদূরের সপ্ত সিন্ধু ৪৭
চুনী দাশ—এই এই ৪৭
সৌমেশ্বর ভৌমিক—ছেলেটা ৪৮
অভিজিৎ বাগচী—ছড়া ৫১
কালিদাস ভট্টাচার্য—দুঃখ শুধু ৫১
জীবন সর্দার—প্রকৃতি পড়ুয়ার দপ্তর ৫২
অজয় হোম—খেলাধুলা ৫৬
চঞ্চল পাল—মনের রঙীন চশমা ৫৮
ময়ূখ চৌধুরী—ইতিহাসে পলাতক ৬০

অগ্রহায়ণ
১৩৮২

সন্দেশ

নভেম্বর
১৯৭৫

কাঁদল বুঝি ঘুমের পরী

ধূর্জটি প্রসাদ দত্ত

পদ্মপাতায় আলতো ফোঁটা
হিম-ঝুরঝুর মুক্তো গোটা
ভোর রাতে কার কান্না খানিক
ছলকে পড়া পান্না মাণিক,
কাঁদল বুঝি ঘুমের পরী
কান্না তো নয়—শিশিরগুঁড়ি,
ছড়িয়ে গেল হালকা হাওয়ায়
ঝিঁঝিপোকার গুমোট গাওয়ায়
ব্যাঙের ছাতায়, অশথ ডালে
গোয়ালপাড়ায় খড়ের চালে
কুঁড়ির পিঠে, মাদার বনে
ঝাঁপ টানা কার উঠোন কোণে,
জমল এসে হাটের বাটে
পদ্মপাতায় পুকুরঘাটে।
যেই না খোলা দিনের ডালা
সাতটি ভুবন আলোয় আলা,
পড়তে আলো চাঁদ লুকাল
জলের ফানুষ মিলিয়ে গেল।

লীলা মজুমদার

মানসযাত্রা

[৩]

এই মানস-সরোবরের তীরে দাদামশাই এক সপ্তাহ ছিলেন। সেই অপূর্ব সুন্দর স্থান ছেড়ে আসতে ইচ্ছা করছিল না, মনে হচ্ছিল এখানেই বাকি জীবনটা কাটিয়ে দেওয়া যায়। তবু ফিরতে হল, সঙ্গীরা তাঁকে নিয়ে রওনা দিল। আস্তে আস্তে চলতে লাগলেন দাদামশাই, বারে বারে থেমে, ফিরে ফিরে মানস-সরোবর দেখতে লাগলেন। যতক্ষণ দৃষ্টি যায়, ততক্ষণ এইভাবে কাটল। এবার সামনে আবার চড়াই। সরোবরের সীমানা ছাড়িয়ে উঁচুতে উঠছিলেন বলে আরো কিছুক্ষণ নীল জল দেখতে পেলেন। যেতে যেতে বেলা বেড়ে চলল, জল তেষ্টায় সকলের ছাতি ফাটবার জোগাড়। কোথাও এতটুকু জলের চিহ্ন নেই। দু দিকে উঁচু পাহাড়, মাঝখানের সরু পথ দিয়ে চলেছেন, এখানে জল কোথায় পাবেন?

চলতে চলতে এক সময় একটা গুহা দেখে হয়রাণ হয়ে সকলে বসে পড়লেন। আর এক পা চলারও শক্তি নেই। তারি মধ্যে এদিক ওদিক জল খোঁজা হল, পাওয়া গেল না। হঠাৎ দাদামশায়ের মনে পড়ল এ হল চিরতুষারের দেশ, পায়ের নিচে যে রকম মাটি দেখা যাচ্ছিল, তার তলায় বরফ থাকা সম্ভব। মাটিটা একটু ভিজে, তার ওপর লাঠির বাড়ি মারতেই মাটি সরে গেল। নিচে দেখা গেল রাশি রাশি বরফ। ততক্ষণে খুব রোদ উঠে গেছিল। সঙ্গীরা ঐ বরফ তুলে পাত্রে করে রোদে রাখতেই, বরফ গলে জল বেরুল। প্রথমেই সেই জল পান করে সকলে তৃষ্ণা মেটালেন, তারপর কিছু কাঠ জড়ো

করে, রান্নার হাঁড়িতে বেশি করে বরফ গলিয়ে জলের ব্যবস্থা হল।

সেখানেই বিপদের শেষ নয়। ওঁরা বিশ্রাম করছেন, এমন সময় দেখেন পাহাড়ের উঁচু চূড়া থেকে একজন ঘোড়সোয়ার নেমে আসছে। দেখেই মনে হল লোকটা ডাকাতদলের গুপ্তচর হবে। ক্রমে সে কাছে এসে লোলুপ দৃষ্টিতে ঘরছাড়া সন্ন্যাসীদের সামান্য জিনিসপত্র দেখতে লাগল। দাদামশায়ের চাকর বিষ্ণু সিং ওর সঙ্গে কিছুক্ষণ কথা বলেই বুঝতে পারল গুপ্তচর-ই বটে। তখনকার মতো লোকটা চলে যেতেই ওঁদের আর সেখানে থাকার ভরসা হল না। ওঁরাও তখন তাড়াতাড়ি জিনিসপত্র তুলে ফেলে সে জায়গা ছেড়ে আবার রওনা হয়ে পড়লেন। তারপর সমস্ত দিন হেঁটে বিকেলে একটা নদীর ধারে এসে পৌঁছলেন। ভাবলেন নদী পার হয়ে ওপারে পৌঁছতে পারলে, খানিকটা নিরাপদ হওয়া যায়। দুঃখের বিষয় নদীর গোড়ার দিকে হয়তো কোথাও বৃষ্টি হয়ে থাকবে, তাই নদীতে জল বেশি; জল না কমলে পার হবার উপায় নেই। এদিকে কোনো আশ্রয়ও নেই।

স্থির হল নদীর তীরেই খোলা আকাশের তলাতেই সে রাতটা কাটানো হবে। অবলম্বনের মধ্যে কয়েকটা বড় বড় পাথর। তারি আড়ালে রাত্রিবাস। কাঠকুটোও কোথাও পড়ে নেই যে কুড়িয়ে এনে আগুন জ্বালবেন। শেষে স্থানীয় ভুটিয়াদের কাছ থেকে কিছু কাঠ পাওয়া গেল। সেই কাঠ জ্বেলে জল গরম করে চা তৈরি হল। রান্নাবান্না হল না, চা খেয়েই কম্বল মুড়ি দিয়ে মাটিতে শোয়া হল। তাতেও নিস্তার নেই, তার ওপর বৃষ্টি আরম্ভ হল। কি আর করা, সেই বৃষ্টিতেই সকলে শুয়ে রইলেন। দাদামশাই সকালে উঠে দেখেন গায়ের ওপর বরফের তাল জমে রয়েছে। একেবারে গা ঢেকে গেছে, অনেক কষ্টে বরফ সরিয়ে উঠতে হল, চাংড়া চাংড়া বরফ এদিকে-ওদিকে পড়ে গেল। সকলেরি ঐ দশা। কিন্তু বরফের নিচে সে রাত্রে সকলে আরামে ঘুমিয়েছিলেন। এতে আশ্চর্যের কিছুই নেই; যারা বরফে চাপা পড়েও মৃত্যুর হাত থেকে কোনোমতে উদ্ধার পেয়েছে, তাদের বলতে শোনা যায় যে বরফের তলায় শীত টের পাওয়া যাচ্ছিল না, ভারি আরাম বোধ হচ্ছিল, ঘুম আসছিল। বাইরের ঠাণ্ডা বাতাস গায়ে না লাগার জন্যই হয়তো ঐরকম মনে হয়।

সকালে উঠে আবার চলা। বৃক্ষহীন উঁচু মালভূমি থেকে দাদামশাইরা ক্রমে নামতে নামতে পুরাং উপত্যকায় পৌঁছলেন। জায়গাটা উর্বরা, প্রচুর মটর আর গম হয়। অনেক দিন শুধু বরফ আর বরফ দেখে, এবার সবুজ শস্যের ক্ষেত দেখে দাদামশাইদের চোখ জুড়িয়ে গেল। ভালো আশ্রয়ও পাওয়া গেল। একজন স্থানীয় গৃহস্থ খুব আদর করে ওঁদের বাড়িতে ডেকে নিলেন। এইরকম কত অচেনা অজানা মানুষের কাছে দাদামশাইরা আদর আপ্যায়ন পেয়েছিলেন তার হিসাব নেই। ঐ বাড়িতে রাত কাটিয়ে ওঁরা পরদিন তকলাখার রাজধানীতে পৌঁছলেন। সেখানে ঐ সময়ে 'শিবলিঙ্গের মেলা' বসেছিল। এই মেলায় চারদিক থেকে ভুটিয়া, তিব্বতী, বেসরী আর নেপালীরা এসে ব্যবসা-বাণিজ্য করত। তকলাখার থেকে ইংরেজদের রাজ্যের সীমানা দু দিনের হাঁটা পথ। এখানেও গুহা ছিল, তার একটিতে দাদামশাই আশ্রয় নিলেন; আরেকটা গুহায় দু তিনজন সাধু উঠেছিলেন। দাদামশাইকে দেখে তাঁরা এসে আলাপ করে বললেন, 'চলুন, শিবলিঙ্গের মেলা দেখে আসা যাক।'

নদীর ওপারে গিয়ে দেখলেন দক্ষিণদিকে উঁচু উঁচু পাহাড়, সেই সব পাহাড়ের গায়ে অসংখ্য গুহা। কোনো এক সময়ে সম্ভবতঃ বাস করবার উদ্দেশ্যেই মানুষ হাতে করে এগুলো কেটেছিল, সবগুলোই কৃত্রিম। কোনোটা দোতলা, কোনোটা তিনতলা। যে সব গুহা সন্ন্যাসীদের জন্য তৈরি, সেগুলো সাধারণ গুহার-ই মতো, কিন্তু যেগুলোতে গৃহস্থরা বাস করত, সেগুলি ঘর-সংসারের উপযোগী করে বানানো। এ-রকম গুহা দক্ষিণ আমেরিকাতে আর মেক্সিকোতেও আছে।

ঐ পাহাড়ের শিখরে শিবলিঙের মঠ। দাদামশাইরা সেখানে পৌঁছে দেখেন উঁচু আসনে বসে প্রধান লামা একটা বই থেকে পাঠ করছেন। মানুষটির মাথা কামানো, লাল পোষাক পরা, খুব বৃদ্ধ। তাঁকে দেখেই ভক্তি হয়। দাদামশাই তাঁকে প্রণাম করলেন বুড়ো লামা তাঁর মাথায় হাত দিয়ে আশীর্বাদ করলেন। বললেন কাশীর লামা আসাতে তাঁর মঠ ধন্য হয়েছে। দাদামশাই দেখলেন সারি সারি লামারা বসে আছেন, তাঁদের পিছনে ডাবারা বসেছেন। সকলের মুখ এমন ধীর স্থির গম্ভীর যে মনে যেন ছবিতে আঁকা। সামনে বুদ্ধমূর্তি, তার নিচে অগণ্য ঘিয়ের প্রদীপ জ্বলছে, ধূপদানিতে ধূপ পুড়ছে, তার সুগন্ধে চারদিক ভুরভুর করছে। থেকে থেকে পাঠ বন্ধ হলে, বাঁশি আর ডমরু বাজছে, আবার পাঠ হচ্ছে। লামারা আর ডাবারা সমস্বরে স্তব করছেন। দরজার কাছে আটজন বাদ্যকর বসে, এরাই বাঁশি বাজাচ্ছে; স্তবপাঠের তালে তালে সে বাঁশি শুনতে বড় মধুর। ডমরু বাজাচ্ছেন লামা ও ডাবারা, প্রত্যেকের হাতের কাছে একটি ডমরু।

পরে একজন লামা দাদামশাইকে ডেকে পাশের একটা ঘরে নিয়ে গিয়ে আদর করে চা আর ছাতু খেতে দিয়ে বললেন, প্রধান লামার অনুরোধ দাদামশাই যেন ঐ মঠে এক দিন থেকে যান। দুঃখের বিষয় পরদিন খুজরুনাথ যাবার সব ব্যবস্থা হয়ে গেছিল, কাজেই লামার কথা রাখা সম্ভব হল না।

ভারত থেকে তিব্বত যাবার সেকালে যতগুলি পথ ছিল, তার মধ্যে নৈনিতাল হয়ে তকলাকোটের গিরিপথই সব চাইতে নিরাপদ ও সহজ ছিল। তকলাখারেরই আরেক নাম তকলাকোট। এখানে এক রাত থেকে পরদিন ভোরে খুজরুনাথ যাত্রা। খুজরুনাথ ওখান থেকে প্রায় দশ মাইল দূর। মস্ত বড় তীর্থস্থান

খুজরুনাথ, সেখানে বহু যাত্রী আসে যায়। দাদামশাইরাও তাদের সঙ্গে মন্দিরের দরজায় উপস্থিত হলেন।

মন্দিরের মধ্যে বহু লামা আর ডাবা বসে ধর্মালোচনা করছিলেন। তাঁদের সামনে সাত আট হাত উঁচু একটি দেবী মূর্তি। ডান দিকে আরেকটি ঘরে গোল করে বিশাল বিশাল দেবমূর্তি সাজানো, তাদের মধ্যে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর ইন্দ্রকে দাদামশাই চিনতে পারলেন। বাকিরা অচেনা। অপূর্ব সুন্দর সব প্রাচীন মূর্তি, পাথরে তৈরি, দেখে ভক্তি হয়। আগেই বলেছি তিব্বতের বৌদ্ধরাও হিন্দু দেবদেবীদের ভক্তি করতেন। সুদূর প্রাচ্যে আজো অনেকে তাই করেন।

ওখানে আরেকটি মন্দিরও দেখলেন ওঁরা, তার বাইরে কোনো জাঁকজমক ছিল না। দরজার পাশে এক বুড়ো বুড়ি জপ করছিলেন; বুড়ির নাকি ১৬০ বছর বয়স, বুড়োর ১০৫! মন্দিরে ঢুকেই দাদামশাই চমকে উঠলে; ভিতরটা আলোয় আলো, সুন্দর দেবমূর্তি, ইনিই খুজরুনাথ দেব; দেখে মনে হল কোনো জীবন্ত দেবতা বুঝি পাষণ্ডদের জ্বালায় পৃথিবীতে নেমে এসেছেন।

আরো অনেক গিরি-পর্বতে মঠ মন্দিরে দাদামশাই ঘুরে বেড়িয়েছিলেন, দুঃখের বিষয়, তার বিবরণীগুলো হারিয়ে গেছে, যেটুকু পাওয়া গেছে তার মধ্যে থেকে ওঁদের ফিরে আসার বর্ণনা কিছু কিছু পাওয়া যায়। নিজের এই সময়কার মনের ভাবের কথা দাদামশাই লিখেছিলেন, 'আমার দেশ কোথায়? আমি তো সন্ন্যাসী, আশ্রয়হীন, স্বদেশ বিদেশের প্রভেদ রাখি না। বৃক্ষতল আমার বাসস্থান, ভিক্ষান্ন আমার উপজীবিকা, রাস্তাঘাট নদী পর্বত গুহা-কন্দর আমার আরামের উদ্যান, সুতরাং আমার দেশ কোথায়?...তবু আমি বাঙ্গালী, বাঙ্গলা দেশের দিকে আমার মন টানিতেছে, তাই আজ তাড়াতাড়ি তিব্বতের পূর্বপ্রান্ত হইতে বঙ্গদেশের দিকে চলিলাম।' অতএব এবার ফেরার পালা।

খুজরুনাথে পৌঁছবার পরদিন ভোরে আবার তকলাখারের দিকে যাত্রা। তার পরদিন তকলাখার ছেড়ে নদীর তীরে তীরে কেবলি পশ্চিমমুখী হয়ে চলা। মনটা বড় খুসি। একে একে ত্রেতাপুরী, কৈলাস, মানস-সরোবর, খুজরুনাথ দেখা হয়েছে, এই দুর্গম দেশে সে রকম কোনো বিপদ-আপদ ঘটেনি, শরীর সুস্থ আছে, রাজা কোনো উৎপাত করেননি, তাছাড়া যে-পথে এখন চলেছেন, তার দুই ধারে সবুজ শস্যক্ষেত। চোখ জুড়িয়ে যাচ্ছে। সব কিছু অবশ্য মনের মতো হয় না; এই মনোরম জায়গায় গৃহস্থরা কেউ তাঁদের আশ্রয় দিল না। শেষটা হেঁটে হয়রাণ হয়ে বেলা চারটের সময় তাঁরা পথের ধারেই বসে পড়লেন। এমন সময় একজন দয়াবতী মহিলা এসে বললেন, 'তোমরা আমার বাড়িতে চল, এই মাঠে থাকবে কি করে? বরফ পড়লে আর রক্ষা পাবে না।' দাদামশাইরা তাঁর সঙ্গে তাঁর বাড়িতে গেলেন। মহিলা ওঁদের প্রথমেই ছাতু খাওয়ালেন। তারপর রান্নার ব্যবস্থা করে দিলেন, আটা চাল মাংস আর মাখন ইত্যাদি দিলেন। অনেকদিন পরে ভাত আর অন্য ভালো জিনিস পেয়ে সকলেই খুব খুসি। রান্নাবান্না, খাওয়াদাওয়ার পর, রাতটাও ভালোভাবেই কেটে গেল।

গৃহস্থকে শত শত আশীর্বাদ করে, পরদিন সকালে দাদামশাইরা সেকরামণ্ডির পথ ধরলেন। সামনেই উঁচু পাহাড়, সেই পাহাড় চড়তে আরম্ভ করলেন। বড় দুর্যোগ, বরফ আর বৃষ্টি একসঙ্গে পড়তে লাগল আর সেকি মেঘের গর্জন। ভীষণ জোরে বাতাস বইতে লাগল, কোথাও আশ্রয় পেলেন

না, কাপড়চোপড় ভিজে একাকার। বরফ যদি বা বন্ধ হল, বাতাসের সঙ্গে শিল উড়ে এসে ছর্‌রা গুলির মতো গায়ে বিঁধতে লাগল। শেষ পর্যন্ত দাদামশায়ের দুই ভক্ত হাল ছেড়ে দিয়ে, কাপড় দিয়ে গা-মাথা ঢেকে, পাহাড়ের ওপরেই শুয়ে পড়ল। দাদামশাই বুড়ো হলেও অন্য রকম মানুষ ছিলেন, তিনি চাকর দুজনকে নিয়ে জল বাতাস বরফ ভেদ করে পাহাড়ের চূড়ো ডিঙিয়ে অন্য দিকে নামতে শুরু করলেন। ক্রমাগত দু তিন মাইল হেঁটে, ওঁরা পাহাড়ের পাদদেশে পৌঁছলেন। এখন আর কোনো ভয় নেই। সঙ্গী দুজনের জন্য মনে বড় ভাবনা হল, তারা কি আর আসতে পারবে? দাদামশাইয়ের কথায় বিষ্ণুসিং ওদের খোঁজে আবার ফিরে গেল এবং ঘণ্টাখানেক বাদেই তাদের সঙ্গে নিয়ে এসে উপস্থিত হল।

তাদের চেহারা দেখে দাদামশায়ের চক্ষু স্থির, কাপড়-চোপড় ছেঁড়া-খোঁড়া, বরফ পড়ে শরীর রক্তাক্ত, মুখ ফ্যাকাশে, এক পা চলতেও কষ্ট হচ্ছে! দাদামশাই মুস্কিলে পড়ে গেলেন, এমনি জায়গা যে এক টুকরো কাঠ জ্বালিয়ে ওদের গা গরম করবেন; তার উপায় নেই অগত্যা শুকনো কাপড় আর কম্বল দিয়ে গা ঘষে ওদের খানিকটা সুস্থ করে তোলা হল। তারা বলল তারা জীবনের আশা ছেড়ে দিয়েছিল, বিষ্ণুসিং গিয়ে তাদের একরকম জোর করে তুলে টেনে নিয়ে এসেছে।

সেকরামণ্ডিতে চেনা লোকের সঙ্গে দেখা হল, বরখার রাজা আর জুগুম্ফার প্রধান লামা। দোভাষীর সাহায্য নিয়ে দাদামশাই রাজার সঙ্গে কিঞ্চিৎ শাস্ত্রচর্চা করলেন, দুজনেই খুব আনন্দিত। দূর পথ যাবেন দাদামশাইরা, রাজা তাই যথেষ্ট খাবার দাবার সঙ্গে দিলেন। সেকরামণ্ডি থেকে ওঁরা জ্ঞানিমামণ্ডিতে এলেন। কষ্ট যথেষ্ট পেতে হল, কারণ পথে দারুণ বৃষ্টি, সমতল মাটিতে জল দাঁড়িয়ে গেল, সেই জলে দাদামশাই বার দুইতিন পড়েও গেলেন। একজন ভুটিয়া তাঁকে টেনে তুলল। ঠাণ্ডা শরীর, প্রায় অসাড়, অচেতন অবস্থায় জ্ঞানিমামণ্ডিতে পৌঁছলেন। এখানেও চেনা লোক পাওয়া গেল; বিষ্ণুসিংএর বাবা ওখানে ব্যবসার জন্য এসেছিল। সে দাদামশায়ের গা রগড়ে, গরম জামা কাপড় পরিয়ে, গরম চা খাইয়ে সুস্থ করে তুলল। শরীর ভালো হলে দাদামশাই ওদের অনেক ধর্মকথা বলেছিলেন। এখানে একজন যোগিনীর সঙ্গে দেখা হয়েছিল, তাঁর নাকি দুশো বছরের বেশি বয়স।

তারপর নানান্ জায়গা ঘুরে থুলিং মঠে পৌঁছলেন। এবার দেশে ফেরার পালা। ফেরা হল নতুন পথে, যে-পথে এসেছিলেন সে দিকে আর যাওয়া হয়নি, মরগাঁও গাঁয়ের প্রধানের সঙ্গেও দেখা হয়নি। এই বাড়ি ফেরার কথায় দাদামশাই লিখেছিলেন,

'তিব্বত প্রবেশ করিতে হইলে দুই অথবা তিনটি গিরিদুর্গ অতিক্রম করিতে হয়। আমি যে পথে তিব্বত হইতে বাহির হইতেছি, সেই পথে দুইটি গিরিদুর্গ। একটির নাম মলু্‌খাগা, অন্যটির নাম নীলং এই নীলং পাস্ উল্লঙ্ঘন করিয়া বেসার রাজ্যের লোক ও টিরি রাজ্যের ব্যবসায়ীরা তিব্বতে প্রবেশ করে।...বৎসরের মধ্যে ছয় মাস নীলং পাস্ খোলা থাকে।...নীলংএর নিম্নেই শতদ্রু নদী প্রবাহিত হইয়া পাঞ্জাবের দিকে চলিয়া গিয়াছে। নীলংএর অধিবাসীরা বৎসরের মধ্যে ছয় মাস কাল ব্যবসায়ের জন্য তিব্বতে যাইয়া থাকে। পরে দুই এক মাস নীলংএ বাস করে! আর যখন খুব বরফ পড়িতে আরম্ভ করে, তখন গঙ্গোত্রীর নিচে সমস্ত টিরি রাজ্যে ভ্রমণ করিয়া বেড়ায়।

এখন তিব্বতে বরফপাত আরম্ভ হইয়াছে, নীলংএর অধিবাসীরা নীলংএ ফিরিয়া আসিয়াছে। এদিকে ধান পাকিয়াছে, যব পাকিয়াছে, তাহারা বড়ই আনন্দে ধরাখানাকে সরা জ্ঞান করিয়াছে। আজ আমি নীলংএর অতিথি।' এদিকে নীলংএ পৌছে ওঁদের খাবারদাবার ফুরিয়ে গেল নীলং থেকে গঙ্গোত্রী তিন চার দিনের পথ, মাঝখানে কোনো লোকালয় নেই। দাদামশাইরা পাঁচজন লোক, সকলে তো আর না খেয়ে থাকতে পারে না। খোঁজ খবর নিয়ে শুনলেন সামনের পাহাড়ে একজন লামা থাকেন, তাঁর কাছে ন্যায্য দামে খাবার জিনিস পাওয়া যাবে। সেই চেষ্টায় দাদা মশায়ের ছোট দলটি পাহাড়ের ওপর লামার বাড়ি গেলেন। গয়ে দেখেন মহা মুস্কিল! লামার বাড়ি লোকে লোকারণ্য কিন্তু সকলেই মাতাল; শীতের দেশের লোকে সাধারণতঃ মদ একটু বেশিই খান।

অবস্থা বুঝে দাদামশায়ের সন্ন্যাসী শিষ্য পূর্ণানন্দ ভয়ের চোটে পালিয়ে গেল এমনকি বিষ্ণুসিংহেরো দরজা পার হবার সাহস হল না। আগেই বলেছি দাদামশাই অন্য পদার্থ দিয়ে তৈরি ছিলেন, তিনি তখন সোজা ঢুকে গিয়ে মঠের লামার কাছে উপস্থিত হলেন, লামা তাঁকে আদর করে অভ্যর্থনা জানালেন, তিনি অনেকটা প্রকৃতিস্থ, ছিলেন। তাঁর অনুচররাও আদর জানাল, কিন্তু সে হল গিয়ে মাতলামির আদর, তাতে দাদামশাই হাঁপিয়ে উঠলেন।

লামার কাছে চাল, আটা, ছাতু, মাখন পাওয়া গেল। কিছুতেই তিনি দাম নিলেন না, বরং উল্টে বললেন আরো যদি দরকার হয় আরো দেবেন। খাবারদাবারের ব্যবস্থা হয়ে গেল; এর পর নীলং ছেড়ে ওঁরা গঙ্গোত্রীর দিকে রওনা হলেন। মনে হচ্ছিল যেন বাড়ির কাছে এসে পড়েছেন, সাধারণতঃ যাত্রীরা কিন্তু গঙ্গোত্রীর কাছাকাছি পেঁছিলে মনে করে কতদূর চলে এলাম! গঙ্গোত্রীর কাছাকাছি এসে দাদামশাই লিখেছিলেন,

'যোশীমঠ হইতে আরম্ভ করিয়া এ পর্যন্ত অদ্য নদীতীর গিরিগহ্বর, কল্য বৃক্ষমূল পর্বতশৃঙ্গই রাত্রি বাসের স্থান ছিল। কখনও কখনও গৃহ মিলিত বটে, কিন্তু তাহাও গহ্বরের অনুরূপ; ছাতু মাখনই ছিল প্রধান আহারীয়, দোভাষীর সহিত কথাই ছিল বাক্যালাপ, অপথই ছিল পথ, পার্বতীয় নদী ছিল পানীয় জল। অদ্য সব দুঃখ যাইবে, এই ভাবিয়া একান্ত উৎসাহের সহিত চলিতে লাগিলাম।'

জোপাং বলে একটা জায়গায় পেঁছে দাদামশায়ের দুই পাহাড়ি ভৃত্য বিদায় নিল। অনেকদিন তারা অতি যত্নে ও বিশ্বাসযোগ্যভাবে প্রভুর কাজ করেছিল; তাদের বিদায় দিতে নিশ্চয়ই দাদামশায়ের কষ্ট হয়েছিল দাদামশাই এগারো হাজার ফুট উঁচু ভৈরবঘাটিতে পেঁছে, এক রাত সেখানে বিশ্রাম করলেন। পরদিন সকালে রওনা হয়ে গঙ্গোত্রী পেঁছলেন। তার পর থেকে মামুলী তীর্থযাত্রীর পথ ধরে দেশে ফিরলেন। তিন বছর পরে ১৯০১ সালে কাশীতে তাঁর মৃত্যু হয়েছিল।

ঐ সব জায়গার অপূর্ব দৃশ্য, হিমালয়ের কোলে গঙ্গার উৎপত্তি, গঙ্গোত্রী থেকে দশ বারো ক্রোশ উঁচুতে গোমুখীর দৃশ্য, সব কিছুর বর্ণনা দিয়েছিলেন দাদামশাই তাঁর 'হিমারণ্যে'। সেই গ্রন্থের সব অধ্যায়গুলি যদি কখনো পাওয়া যায়, পাঠকরা পড়ে মুগ্ধ হয়ে যাবেন।

॥ শেষ ॥

মন্দাকিনীর কাণ্ড

অশোক মুখোপাধ্যায়

মিষ্টি মেয়ে মন্দাকিনী
    মুখ খুললে মুক্তো ঝরে,
তার যে এমন মিথ্যে বুলি
    জানতো না কেউ ঘুণাক্ষরে।
জানতো না তার নিজের পিসি
    জানবে কিসে অন্য জন,
মন্দাকিনীর কাণ্ড শুনে
    এখন সবাই ধন্য হোন।—
শনিবারের সন্ধ্যাবেলা
    পিসি তখন ঠাকুর ঘরে
মন্দাকিনী ফোনটি তুলে
    ডাকল আকুল ব্যাকুল স্বরে :
'হ্যালো হ্যালো ফায়ার ব্রিগেড,
    জলদি আসুন বিডন স্ট্রীটে,
আগুন আগুন, দারুণ আগুন
    আমাদের এই বারোর 'সি' তে।'
আর কথা নেই! আচম্বিতে
    তোলপাড়িয়ে জাগল পাড়া,
ঝনঝনিয়ে ঢনঢনিয়ে
    ঘণ্টা দিয়ে আসছে তারা—
আসছে বড়োবাজার থেকে,
    শিয়ালদহ স্টেশন থেকে,
আসছে তারা পুরো দমে
    কল বাগিয়ে ভীষণ বেগে!
'আগুন! আগুন! মইটা আনো,
    হাইড্রান্টের ঢাকনা তোলো,
হোসপাইপে জল ভরে নাও
    বন্ধ সকল জানলা খোলো;
চ্যাঁচায় সবাই চতুর্দিকে
    বাধায় বিকট হট্টগোল,
জলের তোড়ে শোবার ঘরে
    বিছ্না-বালিশ ভিজে ঢোল;
পাশেই ছিল কলাভবন—
    দেয়াল ভরা ছবি তার,
জলের স্রোতে এক নিমেষে
    ধুয়ে মুছে পরিষ্কার;
রাঙাদাদুর লাইব্রেরিতে
    শেল্‌ফে ছিল হাজার বই,
জলের চাপে চুপসে গিয়ে
    এক নিমেষে ধরা-সই;
আপিস-ফেরৎ আশীষ কাকা
    সাজাচ্ছিলেন চুলের 'ফোল্ড'
জলের গোলা ছিটকে লেগে
    একেবারে 'কিলিন বোল্ড';
ঠাকমা ছিলেন বারান্দাতে
    চাদর গায়ে চোখ বুঁজে,
ঠাণ্ডা জলের ঝাপ্টা খেয়ে
    ককিয়ে ওঠেন মুখ গুঁজে;
রান্না ঘরে ক্ষ্যাপার মা সে,
    যেই এসেছে জানলাতে,
জলের তোড়ে হড়কে গেল,
    ঝোল্ বেড়ে যায় ডালনাতে।
ওলট-পালট জল ছটাছট—
    শনিবারের বারবেলা—
মিষ্টি মেয়ে মন্দাকিনী—
    বোঝ এখন তার ঠ্যালা!

কাণ্ড আরও ঘটত কত
    মরত ঠিকই ক্ষ্যাপার মা,
সময় মত পিসি এসে
    সামাল দিলেন ব্যাপারটা—
মিষ্টি কথার সঙ্গে তিনি
    বিশটি টাকা দিলেন, নীট,
তখন আগুন নিভে গিয়ে
    ঠাণ্ডা হ'ল বিডন স্ট্রীট।

মিল-গরমিল

নোটুবিহারী চট্টোপাধ্যায়

জগা এবং কালীচরণ একই পাড়ায় থাকে,
    জগা দীঘল, কালাচরণ বেঁটে,
লেখাপড়া জানা কালী,—ছ' ছটো পাশ করা,
    জগার কিন্তু বিদ্যে নেইকো পেটে।
জগা কালো মোষের মতন, রাম গরুড়ের মুখ
    দিনে রাতে হাসতে জগার মানা।
কালীর আনন নরম মাখন, মোমের মতন সাদা।
    মিষ্টি যেন তাজা বেলের পানা।
জগার লোহার দোকান আছে, পয়সা তো বাপ্ মা,
    কালীর ভরসা চাকরী,—পাড়ায় শোনা।
গরমিলটাই বেশী দেখি জগা কালীর মাঝে,
    মিল যা আছে আঙুলে যায় গোণা।
কালীচরণ যজ্ঞেশ্বর ছুই-ই বাড়ির মালিক,
    কণ্ঠস্বরে কেউ যায় না কম,
ষণ্ড ছুটির অশান্ত রব ওঠে যখন তখন,
    নেই বুঝি তার কোথাও যেন সম।
বাদশাজাদার মেজাজ ওদের, হাতেই কাটে মাথা
    লুটোতে চায় বিশ্ব পায়ের তলে,
ধরাটাকে সরা ভাবে, ভাবে ওরাই সেরা,
    'টাকার গরম'—পাড়ার লোকে বলে।

সেই বৃদ্ধ ভদ্রলোকটি

দেবাশীষ গুপ্ত চৌধুরী

'দাদু, রমেন ঘোষ হওয়ার স্বপ্ন দেখলেন নাকি ?'

'এ্যাই এ্যাই চুপ কর ! দেখছিস না রমেন ঘোষের গুরুর ঠাকুর্দা খেলছেন ।'

'দাদু, যা দারুন খেলবেন না, রমেন ঘোষ কোথায়, পেলেকে নাকানি-চোবানি খাওয়াবেন !'

ইত্যাদি ব্যঙ্গোক্তিগুলো ছড়িয়ে দিচ্ছিলাম আমি এবং আমার কতিপয় বন্ধু। যাঁর উদ্দেশ্যে ছড়াচ্ছিলাম তিনি কিন্তু নির্বিকার।

ব্যাপারটা হল, পার্কে একজন বৃদ্ধ ভদ্রলোক, জার্সি-হাফ্‌প্যান্ট-সুট পরে একটি ফুটবল নিয়ে এসেছেন (তিনি এখনও অবশ্য খেলা শুরু করেননি)। তাঁকে দেখে আমাদের মধ্যে (আমরা যারা পার্কের বেঞ্চে আড্ডা দিচ্ছিলাম) হাসির হররা পড়ে যায়; বুড়ো বয়সে ভদ্রলোক খেলা শিখতে এসেছেন !

রমেন ঘোষ বিখ্যাত ফুটবলার। আমাদের কোচ অমলদা প্রায়ই তাঁর কথা বলেন—প্রায়ই তাঁর কথা খবরের কাগজে পড়ি। তাঁর বাড়ি আমাদের পাড়া থেকে কাছে হলেও আমাদের পক্ষে যাওয়া সম্ভব হয়নি। ফুটবলের কথা উঠলেই আমরা তাঁর নাম মুখে আনি।

আমার মুখ থেকে মন্তব্য ছুটে গেল—'দাদু—এরা আপনাকে দেখে হাসছে—কিরকম ট্যাকলিং করতে পারেন দেখিয়ে দিনতো।' হাসির ফোয়ারা ছুটল।

বল হাতে সেই বৃদ্ধ নির্বিকার ভদ্রলোকটি এতক্ষণে আমাদের দিকে তাকালেন; 'তোমরা আমাকে কিছু বলছ কি ?'

আমরা নিশ্চুপ।

এমন সময় একটা গুঞ্জন শোনা গেল 'রমেন ঘোষ 'রমেন' ঘোষ' বলে। দেখলাম, একটা সবুজ ট্যাক্সি থেকে দীর্ঘদেহী একজন লোক নামলেন এবং তাঁকে ছেঁকে ধরল অটোগ্রাফ্‌ শিকারীর দল। বুঝলাম, ওই দীর্ঘদেহী লোকটিই রমেন ঘোষ।

হঠাৎ রমেন ঘোষ পূর্ব-বর্ণিত সেই বৃদ্ধ ভদ্রলোকটিকে দেখে ছুটে এসে তাঁর পা ছুঁয়ে প্রণাম করে বললেন 'আরে, আপনি এখানে ! চলুন আমার গাড়িতে।'

কিছুটা বিস্মিত হয়ে একটা বাদাম মুখে পুরে পাশের লোককে জিজ্ঞেস করলাম—'দাদা, রমেন ঘোষ যাকে গাড়ি করে নিয়ে গেলেন, সেই বুড়ো লোকটি কে ?'

'তাও জানেন না ! উনি রমেন ঘোষের গুরু—রমেন ঘোষ ওঁর কাছ থেকে ফুটবল শিখেছেন...'

আমার হাত থেকে বাদামের ঠোঙাটা পড়ে গেল।

বোতলের যাদু

সুবিনয় রায়

সদর বাজারের মোড়ের ঠিক উপরেই পুরনো হলদে বাড়িটার একতলার ঘরে রহমৎখাঁর দোকান। কতকাল যে সে দোকান ঐ ঘরটায় আছে আমরা কেউ জানি না। রহমৎ খাঁর বয়স যে কত, তাও কেউ বলতে পারে না—কেউ বলে ৭০, কেউ বলে ৮০ আবার কেউ কেউ বলে ১০০র উপর।

দোকানখানা দেখবার মতন বটে! যতরাজ্যের অদ্ভুত, দুষ্প্রাপ্য জিনিস সেখানে পাওয়া যায়। কোথা থেকে যে সেগুলো সংগ্রহ করা হয়েছে, তা কেউ জানে না। কিন্তু অনেক জিনিস যে খাঁটি, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। নবাবী আমলের নানা রকমের দোয়াত কলম, কানখুসকি, গড়গড়া, মোহর, টাকা-পয়সা, এই সবতো আছেই, তাছাড়া হাজার হাজার বছরের পুরনো অদ্ভুত খেলনা, বাসনপত্র, নস্যির কৌটো, তেলের ডিবে, জিভছোলা, ছোটখাট গহনা, ঘর সাজাবার জিনিস, পুঁথিপাটা তামার পাতে লেখা অনুশাসন, ইত্যাদি হাজার রকমের খুঁটিনাটি জিনিস আছে।

বড় বড় খদ্দের, রাজা-মহারাজা, আমীর-ওমরাহ, জমিদার, প্রোফেসর, উকিল, ডাক্তার—রাতদিনই তার দোকানে যাতায়াত করছেন। আবার কখনও দেখা যায় লম্বা আলখাল্লা-পরা চাপ-দাড়িওয়ালা ফর্সা কয়েকটি লোক নানারকমের জিনিস বেচতে দোকানে এসেছে। কখনও দেখা যায় মিশরদেশী লোক এসেছে, কখনও তুর্কির লোক কখনও চিনেম্যান, কখনও নেপালী, কখনও মাদ্রাজী কখনও পেশোয়ারী, কখনও হাবসি কখনও কাফ্রি আসে। দিনরাত বেচাকেনা চলেছেই। রহমৎখাঁ বুড়ো হলেও, খাটবার শক্তি অসাধারণ!

আমরা প্রায়ই তার দোকানে গিয়ে নানান অদ্ভুত জিনিস দেখতাম আর তার পরিচয় পেতাম। সেগুলোর বিষয় কত আজগুবি অদ্ভুত গল্প যে শুনতাম কি বলব! একটা অদ্ভুত বন্দুক ছিল, তার নাম হচ্ছে 'হাঁচি-বন্দুক!' নাদির শার আমলে নাকি সেই বন্দুক চলেছিল। দুই জবরদস্ত হাঁচিবাজ নাকি তাঁর আমলে ছিলেন, একজন ওস্তাদ নস্যি বানানেওয়ালাও ছিলেন। তার তৈরি নস্যি একচিমটি নাকে দিয়ে বন্দুকের নলের সামনে একবার 'হ্যাঁ-চ্চোঃ'—করে সেই হাঁচনেওয়ালা হাঁচলেই বন্দুকে ভরা গুলি পনপন শব্দে ছুটে বেরিয়ে গিয়ে শত্রুর বুক ছেঁদা করে দিত। এই বন্দুকের প্রধান সুবিধা ছিল, এর জন্য বারুদের দরকার হত না। সেই বন্দুক আর নস্যির কৌটো রহমৎ খাঁর দোকানে বিক্রির জন্য রাখা ছিল। দুঃখের বিষয়, নস্যির কৌটোটা একেবারে খালি ছিল, নইলে হয়তো পরখ করে দেখা যেত। এইরকমের আরো কত গল্প শুনেছি তার ঠিক নেই!

একদিন সন্ধ্যার সময় আমি আর বীরেন রহমৎখাঁর দোকানের সামনে দিয়ে যাচ্ছি এমন সময় দেখতে পেলাম, একটি সাড়ে চার হাত লম্বা মানুষ দোকান থেকে বেরিয়ে আসছে। মাথায় তার লম্বা

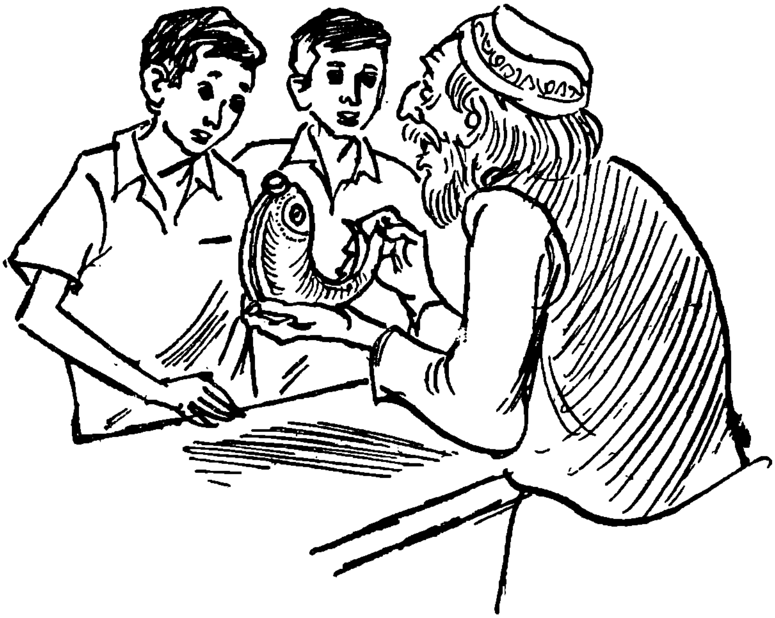

'ফেজ' টুপি, চুল, দাড়ি, গোঁফ মেহেদি দিয়ে লাল রং করা, ধবধবে ফর্সা রং, পরনে লম্বা আলখাল্লা আর পায়জামা, আর পায়ে বুটজুতো। দেখলেই বোঝা যায় বিদেশী লোক।

লোকটির মুখে মুচকি হাসি, হাতে তার এক তাড়া নোট—দেখেই বুঝলাম রহমৎ খাঁর কাছে কিছু সওদা করে বেরিয়ে আসছে! চেহারা দেখে লোকটির বয়স আন্দাজ করা শক্ত, তবে গালের আর কপালের চামড়া কুঁচকে গেছে দেখে মনে হয় বয়স বেশিই হবে।

আমাদের ভারি কৌতূহল বোধ হলো, তাড়াতাড়ি দোকানের ভিতরে ঢুকে পড়লাম। ঢুকেই দেখি, রহমৎ খাঁ ৫।৬টা অদ্ভুত বোতলের মতন জিনিস একটা তাকের উপর সাজাচ্ছে। বোতলগুলি দেখতে ভারি সুন্দর—প্রত্যেকটির গায় সোনালী, রূপালী, লাল, নীল, সবুজ, হলদে ইত্যাদি নানা রঙের কাজ করা, মুখে পাথরের ছিপি আঁটা আর সোনালী রঙের মোহরের ছাপ দিয়ে ছিপি বন্ধ করা। প্রত্যেকটি বোতলের আকার ভিন্ন রকমের। কোনটা কুঁজোর মতন, কোনটা ফুলদানির মত, কোনটা পাখির মত, কোনটা মাছের মত। আমাদের দেখে রহমৎখাঁ একগাল হাসি হেসে বলল 'বাবুসাহেব! আজ সওদায় খুব জিতেছি! এই বোতলগুলি পাঁচ হাজার বছরের পুরনো জিনিস। মিশর দেশে তৈরি। সে সময় হুর আন খামিন মিশরের ফারাও ছিলেন। তাঁর সভায় বালবেক নামে এক অসাধারণ লোক ছিলেন। যাদুবিদ্যায়, হাকিমী শাস্ত্রে, চিত্রবিদ্যায়, মূর্তিগড়ায় তাঁর সমকক্ষ পৃথিবীতে কেউ তখন ছিল না সেই বালবেকের তৈরি এই পাঁচটি বোতল আজ মাত্র ২০০৲ টাকায় কিনেছি। এর এক একটি বোতল অন্তত: ৫০০৲ টাকায় বিক্রি হবে। লোকটি কি আশ্চর্য রকম কারিকুরি জানত, বোতলের গায়ের কাজ দেখেই বুঝবেন।' এই বলে সে একটি বোতল তুলে নিয়ে আমাদের চোখের সামনে ধরল। বোতলের কাজ বাস্তবিকই চমৎকার! অত সূক্ষ্ম, অমন সুন্দর কাজ কেমন করে করল, আর হাজার হাজার বৎসর পরেও কাজগুলি কেমন সুন্দর রয়েছে, দেখে আমাদের তাক লেগে গেল পাথরের ছিপিটি কি সুন্দর, তার গায়ের মোহরও কি সুন্দর!

বীরেন বলল—'দেখেছিস! বোতলের গায়ে ঠিক সেই হাইরোগ্লিফিক্স (Hieroglyphics)এর মতন চিকড়ি-বিকড়ি কি সব ছবি আঁকা! বুক অভ নলেজে এই রকমের ছবি দেখেছি। কিরণের

বড় মামাও এই রকমের চিকড়ি-বিকড়ি লেখা কাগজপত্র নিয়ে নাড়াচাড়া করেন দেখেছি।'

আমার মাস্টার মশাইর আসবার সময় তখন হয়ে এসেছিল, তাই আমি তাড়াতাড়ি বাড়ি চলে এলাম। বীরেন দোকানে রয়ে গেল।

পরদিন সকালে উঠেই দেখি বীরেন হাঁপাতে হাঁপাতে আমাদের বাড়িতে এসে হাজির! তার গায়ে একটা চাদর জড়ানো, গেঞ্জিটা চার পাঁচ জায়গায় ফালি হয়ে ছিঁড়ে গেছে। সে চিরকালের রোগা ছেলে, ছোটবেলা থেকে ভুগছে। তার চেহারা রোগা, রং ফ্যাকাসে। কিন্তু সেদিন তার গালে লাল রঙের আভা ফুটে উঠেছে দেখলাম, চলনটাও যেন উৎসাহ ভরা, কিন্তু মুখে কৌতূহলের ভাব।

আমাকে দেখেই সে বলল—'কাল রাতে ভারি কাণ্ড হয়েছে। তুই তো তখন চলে এলি, তারপর রহমৎ খাঁ সেই মাছের মত বোতলটাকে নাড়া চাড়া করতে লাগল। হঠাৎ বোতলের ছিপিটা কেমন করে জানি খুলে গেল আর ভেতর থেকে এমন চমৎকার একটা সুগন্ধ বের হল যে কি বলব! কিসের যে গন্ধ কিছু বুঝলাম না—কিন্তু গন্ধটি খাসা, চমৎকার—দারুণ সুন্দর! বড়ই দুঃখের বিষয়, মুহূর্তের মধ্যে গন্ধটি আবার বাতাসে মিশিয়ে গেল, বোতলের ভিতর শুঁকেও কোন গন্ধ আর পাওয়া গেল না। রহমৎ খাঁ নিতান্ত আপশোষের সঙ্গে বোতলটি রেখে দিল। আর বাকি বোতলগুলির ছিপি পরীক্ষা করে দেখে নিল সেগুলো ঠিক আছে কিনা। মাছের মত বোতলটার ছিপির মোহরটা একেবারে আলগা ছিল, তাই বোধহয় ছিপি খুলে গেছিল! যাক, এতো এমন কিছুই না, তারপর যা হলো সেট্যাই তোকে বলি। আমি তো তখন তাড়াতাড়ি বাড়ির দিকে রওনা দিলাম, পথে যেতে যেতে মনে যেন এক আশ্চর্য ফুর্তি এল। গায় যেন কত জোর পেতে লাগলাম। বাড়ি এসে, খাওয়া দাওয়া সেরে শুতে যাব এমন সময় দেখি গেঞ্জিটা গায় আঁট হচ্ছে। তখন ফোঁটা ফোঁটা বৃষ্টি পড়ছিল খাটখানা সরানো দরকার বোধ করলাম। খাটের কোনা ধরে দাঁড়িয়ে চাকরকে ডাকব ভাবছি, হঠাৎ দেখি একহাতে অল্প টান দিতেই খাটখানা সরে এল। দুহাতে যে খাট টেনে সরাতে পারতাম না, আজ একহাতে টান দিতেই সেটা অনায়াসে সরিয়ে ফেললাম। আমি তো অবাক! তখন হাতের দিকে তাকিয়ে দেখি হাতের গুলিগুলো যেন আগের চারগুণ বড় হয়েছে, গুলি ফোলাতে আরো বড় আর পাথরের মত শক্ত হল! কিন্তু এদিকে এক বিপদ!—ছাতি বড় হয়ে হয়ে শেষটায় গেঞ্জি এত আঁট হয়ে গেল যে দুচার জায়গায় ফেঁসেই গেল। কি আর করি? খাটে শুয়ে একচোট ঘুম দিয়ে একেবারে রাত কাবার করে দিলাম। ভোরে উঠেই তোর কাছে আসব বলে রহমতের দোকানের সামনে দিয়ে যাচ্ছিলাম। দেখি কি, রহমতের আর সে কুঁজো চেহারা নেই! সটান বুক, গোলাপী গাল, হাত পা বেশ মাংসল গোলগাল গড়নের। সে তখন এক হাতে একটা লোহার চেয়ার তুলে নিয়ে যাচ্ছিল। আমাকে দেখে একগাল হেসে বলল—'বাবু সাহেব! এক নিঃশ্বাস ওষুধের যাদু দেখেছ তো?—সকালে আয়নায় চেহারা দেখে আমি তো অবাক হয়েছিলাম, এখন দেখছি গায়েও আমার যাট বছর আগের জোর ফিরে এসেছে। ওষুধ শুঁকেই আমি বুঝেছিলাম একটা এলাহি কাণ্ড-কারখানা ঘটবে, এমন খোসবয় দুনিয়ায় আর পাওয়া যায় না।' তখন আমিও বুঝলাম ওষুধ শোঁকার

ফলেই এইসব কাণ্ডটা ঘটেছে। যাদবেক লোকটা কি যাদুই জানত? অন্য বোতলগুলোতে না জানি কি আছে।'

আমি তো স্বপ্নের মত সব কথা শুনে যাচ্ছিলাম। চোখকে তো আর অবিশ্বাস করা যায় না, অথচ ব্যাপারটা যেন অসম্ভব-অসম্ভব ঠেকছিল। বীরেনকে আমি বললাম, 'আচ্ছা! কিরণের বড় মামাকে এসব কথা একবার বললে কেমন হয়? তিনি তো মিশরের বিষয়ে কত কাগজ পুঁথিপত্র নাড়াচাড়া করেন, এ বিষয়ে কত প্রবন্ধ লিখেছেন, একবার বিলেত গেছিলেন, মিশরেও গেছিলেন। একটা প্রবন্ধ লিখে 'ডাক্তার' উপাধি পেয়েছেন, মিশর থেকেও কি জানি উপাধি এনেছেন। হয়তো বা তিনি বোতলের গায়ের চিকড়ি-বিকড়ির অর্থও বের করতে পারবেন। কি বলিস ভাই?'

বীরেন উৎসাহের সঙ্গে বলল 'ঠিক বলেছিস! চল এখনিই তাঁর কাছে যাই। আমি তাড়াতাড়ি একটা জামা গায় দিয়ে বীরেনের সঙ্গে বেরিয়ে পড়লাম, কিরণের বাড়ি আমাদের বাড়ির খুব কাছে।

সেখানে গিয়ে দেখলাম, বৈঠকখানার কিরণ বসে খুব দুলে দুলে পড়ছে। কোন ভূমিকা না করেই একেবারে গিয়ে তাকে বললাম—'মেজ মামার সঙ্গে একবার দেখা করতে চাই বড় জরুরি, দরকার!' কিরণও আর কিছু জিজ্ঞাসা না করে, 'আচ্ছা' বলে, আমাদের দুজনকে পাশের ঘরে নিয়ে তার মেজোমামার সামনে হাজির করল।

নমস্কার করে আমরা দুজন সামনে দাঁড়াতেই তিনি একটু হেসে বললেন 'এই যে। কি মনে করে?'

আমি একটু বিনয় করে বললাম, 'আপনি যদি কিছু মনে না করেন—' তিনি 'না না, কিছু না—' বলে হাত ধরে টেনে আমাকে তাঁর তক্তপোষের উপর বসিয়ে, বীরেনকেও বসতে ইশারা করলেন। তারপর বললেন 'বল, কি।'

আমি সমস্ত ঘটনা তাঁকে বললাম, তিনিও খুব মনোযোগ দিয়ে শুনলেন। আমার কথা শেষ হতেই তিনি উৎসাহের সঙ্গে তড়াক করে লাফিয়ে উঠে, একটা পাঞ্জাবী গায়ে দিতে দিতে বললেন, 'চল যাই রহমৎ খাঁর দোকানে।'

হাতে একখানা বই নিয়ে চটি পায় দিয়ে চটাস চটাস করে তিনি চললেন আমাদের সঙ্গে।

রহমৎ খাঁ কিরণের মেজো মামাকে চিনত আর খুব খাতিরও করত। তাঁকে আসতে দেখে সে ব্যস্ত সমস্ত হয়ে উঠে এক সেলাম দিল। তিনিও উত্তর জানিয়ে একগাল হাসলেন। অমন লোককে খাতির না করে কি পারা যায়? ডাক্তার ভরদ্বাজ ভট্টাচার্য এম্ এ, পি এইচ ডি, এম আর এস, এফ আর আই, আরো কত কি!

আমি রহমৎখাঁকে সবকথা বুঝিয়ে বললাম। ভরদ্বাজ বাবুও বললেন 'পুরনো মিশরী ভাষা নিয়ে একটু নাড়াচাড়া করেছি, তাই বড় ইচ্ছে হয় আপনার সেই বোতলগুলো একটু দেখি যদি কিছু নতুন কথা বের করতে পারি! জিনিসটা ভারি আশ্চর্য ঠেকছে।'

রহমৎ খাঁও বোতলগুলি আস্তে আস্তে নামিয়ে একটা টেবিলের উপর রাখল।

ভাই ভাই

অসিতবরণ হাজরা

এক-ফালি জমি নিয়ে কথা কাটাকাটি,
শেষকালে মাথা ফেটে ভিজে গ্যালো মাটি !
পুলিশে কি দারোগায়
এর-ও খায় তারও খায়,
ভাই ভাই মামলায় নামে কাছা আঁটি !!
একটানা বৃষ্টিতে বান ডেকে যায়,
জমি গেলো জলে ডুবে ধান খাবি খায় !
শ্যাম বলে : হায়, দাদা !
রাম বলে : দূর গাধা !
বুকে আয় ! ঝগড়াতো জলের-তলায় !!

ভরদ্বাজবাবু প্রথমেই খালি বোতলটা তুলে নিয়ে, তার গায়ের চিকড়ি বিকড়ি পরখ করে দেখতে লাগলেন। একটু বাদেই কৌতূহলে তাঁর চোখ বড় হয়ে উঠল, হাতের বইখানা খুলে তিনি বললেন, 'একটা পেনসিল আর এক টুকরো কাগজ !'

রহমৎ খাঁ একটা কাগজ আর একটা পেনসিল তাঁকে দিল। তিনিও হিজিবিজি কিসব লিখে, হিসাবপত্র করে বললেন, 'বোতলগুলো এখন বিক্রি করোনা সাহেব ! আমি ভাল খদ্দের জুটিয়ে দেব। আমার এক দোস্ত আছেন, তাঁকে এনে এগুলো একবার দেখাতে চাই। তিনি এ বিষয়ে একজন মহাপণ্ডিত। কাল সকালেই আমি আবার আসব।' এই বলে ভরদ্বাজবাবু বাড়ি চলে গেলেন। বীরেন আর আমিও বাড়ি ফিরলাম।

পরদিন সকালে বীরেন আবার এল, কিন্তু তার চেহারা আর আগের দিনের মতন নাই।—যে তালপাতার সিপাই সে আগে ছিল, আবার তাই হয়ে গেছে। রহমৎ খাঁর সঙ্গে তার দেখা হয়েছিল, সেও আবার আগের মতন রোগা হয়ে গেছে।'

রাত্রে আমাদের আর ভাল করে ঘুম হয় নি। কখন সকাল হবে সুধু তাই ভাবছিলাম। আমরা দুজনে তখনই রহমৎখাঁর দোকানে গেলাম। ইচ্ছাটা, ভরদ্বাজ বাবুর বন্ধু দোকানে এসে কি বলেন শুনি।

একটু বসতেই দেখি ভরদ্বাজবাবু তাঁর বন্ধুকে নিয়ে আসছেন। বন্ধুটির মাথায় টাক, লম্বা চাপ দাড়ি, মোটা গোঁফ, লম্বা চওড়া গম্ভীর চেহারা দেখলেই পণ্ডিত লোক বলে মনে হয়।

দুজনে দোকানে ঢুকতেই রহমৎ খাঁ তাঁদের লম্বা সেলাম করল। তাঁরাও সেলাম নিলেন। ভরদ্বাজবাবু এগিয়ে এসে বললেন—'ইনি আমার দোস্ত—মস্ত বড় পণ্ডিত—অধ্যাপক মহামহোপাধ্যায় ডাক্তার শমনদমন শর্মা, এম-এস-সি, বি-এল, পি-এইচ-ডি, তর্কপঞ্চানন, বিদ্যামহার্ণব, জ্ঞানগুণাকর।

দেখি এঁর সাহায্যে বোতলের যাদুর ব্যাপার যদি কিছু বুঝতে পারি।'

রহমৎ খাঁ তখনই বোতলগুলো সাজিয়ে তাঁদের সামনে টেবিলের উপর রাখল, তাঁরাও বোতল নিয়ে নাড়াচাড়া করতে লাগলেন, কাগজ পেনসিল নিয়ে লিখতে লাগলেন, আর একখানা বড় বই মাঝে মাঝে খুলে কি সব পড়তে লাগলেন।

ভরদ্বাজবাবুর বন্ধুটি কিন্তু গোড়া থেকে যেন কেমন অবিশ্বাসের ভাব দেখাতে লাগলেন। বোতল-গুলি নেড়েচেড়ে বললেন, 'সবগুলিই তো প্রায় খালি! পরখ করে দেখবার তো আর উপায় নাই।'

ভরদ্বাজবাবু বললেন, 'ঐ খালি বোতলটার যে এক কণা গ্যাস ছিল, তারই চোটে এত কাণ্ড যখন হয়েছে, তখন অবিশ্বাসই বা করি কেমন করে?'

প্রোফেসর মশাই বাধা দিয়ে বললেন—'ওসব মনের ধাঁধাও হতে পারে। আমি নিজের চোখে দেখলে বলতে পারতাম'—এই কথা বলেই আর একটি খালি বোতলের ছিপি খুললেন আর নাকের কাছে ধরলেন।

তার পরের মুহূর্তেই তিনি তড়াক করে দাঁড়িয়ে উঠলেন আর একটু মুচকি হেসে, এক চোখ একটু টিপে, সটান ভুড়ি দিয়ে নাচ সুরু করে দিলেন। সঙ্গে সঙ্গে মোটা গলায় সুর করে বলতে লাগলেন— 'আমি রাম খেল তিলক শিং
তাই নাচি তিড়িং তিড়িং'

ভরদ্বাজবাবু বহু কষ্টে হাসি চেপে, চট করে প্রোফেসরের হাত থেকে বোতলটা টেনে নিয়ে, এক চিমটি নস্যি তাঁর নাকে জোর করে ঢুকিয়ে দিলেন। প্রোফেসর মশাই ও 'আমি রামখেল হ্যাঁচ্চো!—তিলক শিং হ্যাঁচ্চো:—তাই নাচি হ্যাঁচ্চো:—তিড়িং তিড়িং হ্যাঁচ্চো: হ্যাঁচ্চো:' দুতিনবার বলে আস্তে আস্তে ঠাণ্ডা হয়ে, জিভ কেটে, হাঁপিয়ে চেয়ারে বসে পড়লেন। নস্যি দেওয়ার দরুণ ওষুধের কাজ ভাল রকম হবার আগেই হাঁচির সঙ্গে গ্যাস বেরিয়ে গেল—তাই রক্ষা!

আমরা এতক্ষণ এত অবাক হয়ে গিয়েছিলাম যে হাসবার কথা একেবারেই মনে ছিল না। অধ্যাপক মশাই থামতেই আমাদের বুক কেটে হাসি এল। আমি বহু কষ্টে মুখে হাত চেপে হাসি থামাচ্ছিলাম কিন্তু, বীরেনটা মুখ চেপেই 'ফ্-ফ্-ফ্' করে হেসে ফেলল। তখন আর বাইরে যাওয়া ছাড়া উপায় কি? যাবার সময় আড়চোখে চোখে নিলাম যে ভরদ্বাজবাবু বেশ মুচকি হাসছেন আর প্রোফেসার মশাই ভ্রূকুটি করে গম্ভীর হবার চেষ্টা করছেন, কিন্তু গোঁফের আড়ালে যেন একটু একটু হাসির ভাব দেখা যাচ্ছে।

আমাদের এত কৌতূহল হয়েছিল যে সেখান থেকে যেতে আর মন সরছিল না, তাই আড়ালে লুকিয়ে কথাবার্তা শুনতে লাগলাম। ভরদ্বাজবাবু—'আচ্ছা! নাম দুটো তাহলে বাংলায় তরজমা করা যেতে পারে, সিংহবল আর বালস্ফূর্তি!'

প্রোফেসর মশাই—'হ্যাঁ, তা মন্দ নয়। আর ঐটার নাম দেওয়া যেতে পারে উদরপূর্তি!'

ভরদ্বাজবাবু—'বালস্ফূর্তি নামটা যে ঠিকই দেওয়া হয়েছে সেটা তোমার নাচ দেখেই বোঝা

গেছে। ভাগ্যে বোতলটা সরিয়ে নিয়েছিলাম আর নস্যির চিমটি নাকে দিয়েছিলাম! যাক, এখন খাঁ-সাহেবের সঙ্গে দর কষা যাক!'

রহমৎ খাঁর সঙ্গে কিছুক্ষণ ফিসফিস করে কি জানি কথাবার্তা বলে তাঁরা বোতল ছয়টা একটা বাক্সের মধ্যে ভরিয়ে একটা ট্যাক্সি ডাকতে বলে দিলেন। ইতিমধ্যে প্রোফেসর মশাই পকেট থেকে চেকবই বের করে একখানা চেক লিখে রহমৎ খাঁকে দিলেন। ট্যাক্সি এলে তাতে চড়ে ওঁরা দুজনে রওনা হলেন আর আমরাও তখন দোকানে ঢুকে রহমৎ খাঁকে জিজ্ঞাসা করলাম 'কত টাকায় রফা হলো।' রহমৎ খাঁ দেখাল একখানা তিন হাজার টাকার চেক! দুশ টাকায় বোতলগুলো কেনা হয়েছিল!

অন্য বোতলগুলোয় কি আছে জানবার জন্য আমাদের ভারি কৌতূহল হলো। ভরদ্বাজবাবুর কাছে গিয়ে জিজ্ঞাসা করতেও সাহস পাচ্ছি না, প্রোফেসর মশাইকে তো চিনিই না! হঠাৎ একদিন 'সান্ধ্য সমাচারে' পড়লাম :—

'অধ্যাপকের রসিকতা—গতকল্য এক মজার ঘটনা ঘটিয়াছিল। বিখ্যাত অধ্যাপক শমন দমন শর্মা মহাশয়ের গৃহে রাত্রে প্রায় একশত অতিথি সমবেত হন। অধ্যাপক মহাশয় কাহাকেও নিমন্ত্রণ করেন নাই, তাই প্রথমে তিনি একটু আশ্চর্য বোধ করেন। জনৈক নিকটতম বন্ধুকে ডাকিয়া তিনি জিজ্ঞাসা করিয়া জানিতে পারেন, তাঁহাদের নিকট মুদ্রিত নিমন্ত্রণ পত্র গিয়াছে। তখন অধ্যাপক মহাশয়ের খেয়াল হয় যে সেদিন পয়লা এপ্রিল !!

তিনিও দমিবার পাত্র নহেন। কোনরূপ ব্যস্ততা প্রদর্শন না করিয়া বড় বড় সতরঞ্চ ও চাদর মুহূর্তমধ্যে আনাইয়া বৈঠকখানা ঘরে সকলের বসিবার স্থান প্রস্তুত করেন। তৎপর অপূর্ব সুগন্ধি সকলের গায় ছিটাইয়া অভ্যাগতদের অভ্যর্থনা করেন। অল্পক্ষণ পরেই 'খাবার প্রস্তুত' বলিয়া সকলকে ডাকেন, কিন্তু সকলেই বলেন তাঁহাদের ক্ষুধার নিবৃত্তি হইয়াছে। কেমন করিয়া যে ক্ষুধা মিটিল তাহা কেহই বলিতে পারিলেন না। অথচ প্রত্যেকটি অতিথির ক্ষুধার সম্পূর্ণ নিবৃত্তি হইয়াছে দেখা গেল। যদিও অনেকে যথেষ্ট ক্ষুধা লইয়া নিমন্ত্রণে আসিয়াছিলেন!

ব্যাপারটি নিতান্তই রহস্যময় ঠেকিতেছিল, কিন্তু পরমুহূর্তেই অধ্যাপক মহাশয় স্বয়ং রহস্য উদ্ঘাটন করিলেন। করজোড়ে তিনি সকলকে বলিলেন :—অদ্য পয়লা এপ্রিল আপনারা জাল নিমন্ত্রণ পত্রে যে গরিবের গৃহে পদার্পণ করিয়াছেন, তজ্জন্য আপনাদিগকে যথেষ্ট ধন্যবাদ। মিশর দেশ হইতে আনীত প্রায় পাঁচ সহস্র বৎসর পূর্বেকার মহৌষধ অপূর্ব সুগন্ধি 'উদর পূর্তির' সাহায্যে মুহূর্ত মধ্যে আপনাদের ক্ষুধার নিবৃত্তি করিতে যে সমর্থ হইয়াছি তজ্জন্য অতীত যুগের যাদুকর মিশর দেশীয় 'বালবেক' মহাশয়কেও আমি ধন্যবাদ জানাইতেছি।

অভ্যাগতদের মধ্যে আওরাজপুরের স্বনামধন্য জমিদার বিপুল বসু রায়চৌধুরী ছিলেন। শুনা যায়, তিনি গোপনে প্রোফেসর মহাশয়ের নিকট হইতে তিনবোতল উদরপুর্তি পাঁচহাজার টাকা মূল্য দিয়া খরিদ করিয়াছেন। অতিথি বৎসল জমিদার মহাশয়ের নিমন্ত্রিতগণের পক্ষে ইহা শুভ সংবাদ বলা চলে না!'

তখন আর আমার কিছু বুঝতে বাকি রইল না 'উদর পূর্তি' ব্যাপারটা কি! পরে এ-কথাও শুনেছিলাম যে সিংহবল সাতদিন পঞ্চাশ নিশ্বাস করে শুঁকলে নাকি শরীরে সিংহের মত বল বরাবরই থাকে !!

'বুদ্ধির উপদেশ'

হাসিরাশি দেবী

চুপ্-চুপ্— ! চেপে যাও ; শোনেনি তো চিংড়ী
দাঁড়া-দুটো ছেঁটে ফেলে বড্ড হবে কাঁকড়া—
ঐ দেখ—বাঁকা ঠোঁটে হাসে উচ্চিংড়ি
আরশোলা চুল রাখে লম্বা ও ঝাঁকড়া !

ওসব খবর নিয়ে কি-বা লাভ আমাদের ?···
গুজব তো যদু-মধু-রামা আর শ্যামাদের !
মোরা দেখে শুনে যাই মেলে চোখ্ কানটা,
ওসব ঘাঁটালে যাবে বিলকুল্—প্রাণটা।

রুই আর কাৎলা কি ইলিশ ও মিরগেল
ওরা জাতে অভিজাত, চুনো-পুঁটি আমরা,
আমাদের গায়ে কম 'প্রোটিন' কি আঁশ-তেল,
ছোট কাঁটা খচ্খচে, মোটা শুধু চাম্‌ড়া।

মোরা ঘুরি হাঁটুজলে, ওরা মাঝখানেতে,
বেনোজলে ঘোরে ফেরে, আসে ফের টানেতে,
ওদের সোসাইটিতে যা ভাল তা করবে,
নিজেদের হিত বুঝে নিজেরাই লড়বে।

আমরা কেবল জানি চুপ ক'রে থাকতে,
এর কথা ওরে ব'লে যোগাযোগ রাখতে ;
আজে-বাজে কথা কেন কানাকানি করবে,
তাই বলি চেপে যাও,—বুঝে কথা বলবে ॥

ধারাবাহিক উপন্যাস

(আমেরিকা-প্রবাসী অধ্যাপক ডঃ সাগ্নিক মৈত্র পনের বছর পরে দেশে এসেছেন, কলকাতায় অনুষ্ঠিত বিজ্ঞান কংগ্রেসের অধিবেশনে যোগ দিতে। একদিনের ছুটির সুযোগে বাসের পথে চলেছেন বেলপুকুর গ্রামে। তাঁকে টেনে এনেছে একটুকরো পুরোন বিবর্ণ কাগজ, একসময়ে যাতে নানা রঙ ছিল,—কৃষ্ণকলির কচি পাতা আর ফুলের, শিউলীর বোঁটার আর পুঁইএর পাকা ফলের। তলায় লেখা 'পাপুকে দিলাম—টপ্পা।'

পাশের বাড়ির রানীকাকিমার বোনের ছেলে টপ্পা যখন মাসীর বাড়ি থাকতে এল, তাদের স্কুলে একই ক্লাসে তার সঙ্গে ভর্তি হল, তখন পাপুর ভারি আনন্দ হল, কারণ কাছাকাছি তার কোন বন্ধু ছিল না।)

(২)

দুপুরে রামায়ণের গল্প পড়তে পড়তে পাপুর তন্দ্রার ভাব এসেছিল, এমন সময় শিকের সঙ্গে বাঁধা টিনের কৌটোটা ঠক্ ঠক্ করে নড়ে উঠল। পাপু বুঝল, টপ্পার কাছ থেকে টেলিফোন এসেছে। এই টেলিফোন টপ্পাই তৈরি করেছে। একটা নারকোল দড়ি পাপুর ঘরের জানলা থেকে টপ্পার ঘরের জানলা পর্যন্ত চলে গিয়েছে নিমগাছের ডালের ওপর দিয়ে। দুদিকের জানলাতে টিনের কৌটো বাঁধা আছে। যে কোন দিক থেকে টানলেই অন্য দিকের কৌটোটা ঠক্ ঠক্ করে নড়ে জানিয়ে দেয় টেলিফোন বাজছে। দুটো কৌটোর পাশেই আছে মাটির বেহালার বাটি দিয়ে তৈরি টেলিফোন। নিমগাছের ডালেই বাঁধা আছে একটা লোহার আংটি। তার ভেতর দিয়ে চলে গিয়েছে একটা ঘুড়ির সুতো। সেটা দুটো টেলিফোনের চামড়ার সঙ্গে লাগানো আছে। পাপু টেলিফোনটা ধরে সুতো টান করে কানে লাগাতেই টপ্পার-গলা শুনতে পেল, 'হ্যালো, পাপু, টপ্পা বলছি। (অন্য লোকের এই টেলিফোনে কথা বলতে বয়ে গিয়েছে—পাপু ভাবল।) শিকারে বেরোবি নাকি?'

পাপু খাটটার দিকে তাকিয়ে দেখল মা খবরের কাগজ পড়তে পড়তে ঘুমিয়ে পড়েছে। সে বলল, 'যাচ্ছি।'

দিদি পম্পা পড়ার ঘরে বসে ছুটির কাজ করছিল। দিদিকে বলল, 'দিদিভাই, আমি টপ্পার কাছে যাচ্ছি।' দিদির উত্তরের অপেক্ষা না করেই সে এক ছুটে দরজার বাইরে পা দিল।

টপ্পা বাঁশের তৈরি তীরধনুক আর গুলতি নিয়ে প্রস্তুতই ছিল। পাপুকে দেখে বলল, 'চল্।'

আমবাগানের ভেতরে পা দিয়েই পাপুর কেমন গা ছমছম্ করতে লাগল। নিঝুম দুপুর একটা পাখি শুধু গুব্ গুব্ করে হিক্কে তোলার মতো অবিরাম ডেকে যাচ্ছে। মাঝে মাঝে দু'একটা কাঠ-বেড়ালি তাদের দেখেই লেজ তুলে পালিয়ে যাচ্ছে। বড় বড় আমগাছগুলোর তলায় এখানে ওখানে কিছু ওল, কচু, হাতিশুঁড়, বিছুটি বা আশশ্যাওড়ার গাছ। তাদের পায়ের চাপে শুকনো আমপাতা-গুলো মাঝে মাঝে মড়মড় করে শব্দ করছে।

টপ্পা বলল, 'পাপু, কোথাও ঢিল-টিল পড়লে রামনাম জপ করবি। জানিস্ তো ঠিক দুপুরবেলা কারা ঢিল মারে। আর শোন্, যদি কোন্ কালো বেড়াল দেখিস, আর দেখার পর সেটা যদি হঠাৎ শেয়াল হয়ে যায়, তবে কিছুতেই ভয় পাবি না। ভয় পেলেই ওরা রক্ত শুষে খায়।'

টপ্পার কথা শুনে তখনই ভয়ে পাপুর প্রাণ উড়ে গেল। কিন্তু লজ্জায় বাড়ি ফিরে যাওয়ার কথাও বলতে পারল না।

কতকগুলো কচুগাছের মাথায় পটোলের মতো কিছু দেখিয়ে টপ্পা বলল, 'এইগুলো কি জানিস? এগুলো হচ্ছে বনফল।'

বনফলের কথা পাপু রামায়ণে পড়েছে। রাম, সীতা ও লক্ষ্মণ বনবাসের সময় বনের ফলমূল খেয়ে থাকতেন। পাপু জঙ্গলের মধ্যে আম জামরুল করমচা ছাড়া খাওয়ার মতন কিছু দেখে নি। একবার আশশ্যাওড়ার ফল খেয়েছিল। রসে ভর্তি টসটসে গোলাপী ফলগুলো খেতে বেশ মিষ্টিও লেগেছিল। কিন্তু রাস্তা দিয়ে যেতে যেতে ধীরুমামা তা দেখতে পেয়ে বলেছিল, 'কিরে পাপু, তোর মা তোকে না খাইয়ে রাখে নাকি? জানিস না, আশশ্যাওড়ার ফল খেলে পাগল হয়?'

পাপু জানত খাওয়ার সময় গান করলেই শুধু পাগল হয়। আশশ্যাওড়ার ফল খেলেও যে পাগল হয়, তা কে জানত! শুনে পাপু তো পরদিন পুকুরে একঘণ্টা ধরে চান করে সর্দি লাগিয়ে ফেলেছিল। তাদের ক্লাসের সুব্রত নাকি জানে যে একবার সর্দি লাগালে আর পাগল হওয়ার ভয় থাকে না।

টপ্পা পাপুকে বলল, 'কি ভাবছিস্রে? বনফল টেস্ট করে দেখবি নাকি?'

পাপুর খুব একটা আপত্তি ছিল না। স্বয়ং রামচন্দ্র যা খেতে পারেন, সে কেন তা পারবে না!

উৎসাহের চোটে টপ্পার আগে পাপুই কামড় দিয়ে দিল তাতে। কিন্তু এক কামড় দিতেই মুখের মধ্যে চিড়বিড় করে উঠল। 'ওরে বাবারে' বলে সেই ফল ছুঁড়ে ফেলে দিতেই পাশের বাঁশঝাড়ের মধ্যে খস্ খস্ করে শব্দ উঠল।

খোনাস্বরে কে যেন বলে উঠল, 'কেডা রে ওখানে ?' চমকে তাকাতেই দুজনেই দেখল, বুড়ি হাতে একটা বুড়ি বাঁশতলায় দাঁড়িয়ে আছে।

'ওরে বাবা রে! ডাইনি রে! পাপু পালা রে!' এই বলে টপ্পা প্রাণপণে ছুট দিল শিকারটিকার ফেলে।

পাপুর পা-দুটো যেন কে পেরেক দিয়ে মাটির সঙ্গে গেঁথে দিয়েছে মুখের চড়বড়ানি আর বুকের ধড়ফড়ানি—দুটোতে মিলে তাকে একেবারে দুর্বল করে দিল। সে আস্তে আস্তে সেখানেই বসে পড়ল।

ডাইনির কথা পাপু অনেক গল্পে পড়েছে। কয়েকদিন আগেই একটা গল্পে পড়েছিল—গ্রামের সীমানায় একটা কুঁড়েঘরে এক ডাইনি থাকত। সে সব বাড়ির ছেলেমেয়েদের ভুলিয়ে নিয়ে এসে তাদের গাছ করে দিত। সেজন্যে তার বাড়ির কাছে অনেক গাছ ছিল। কোন লোক সেদিক দিয়ে গেলে গাছগুলো দীর্ঘশ্বাস ফেলত আর তাদের পাতা থেকে টপ টপ করে জল ঝরত। সেই গ্রামের অনেক বাড়ি থেকে প্রায়ই রাত্তিরে ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা হারিয়ে যেত। গ্রামের লোকরা মনে করত হায়নাতে নিয়ে গিয়েছে। কারণ যেই রাত্রিতে দূরে হাঃ হাঃ করে হায়নার হাসির শব্দ অনেকেই শুনতে পেত।

সেই গ্রামে একজন লোকের বাড়িতে একদিন সকালে এক বুড়ি এল। লোকটার বউ তখন তার ছোট্ট ছেলেটাকে চান করাচ্ছিল। ছেলেটাকে দেখে বুড়িটা বলল, 'তোমার ছেলেটা এত রোগা কেন ? ওর একটু চুল কেটে দাও, আমি তাই দিয়ে একটা মাদুলি করে দেব। সেই মাদুলি পরলে ওর কোন অসুখবিসুখ হবে না।'

তাই শুনে বউটি 'একটু আসছি' বলে ছেলে কোলে করে ঘরে এসে ঢুকল। তার স্বামীকে

সমস্ত ব্যাপারটা বলতেই লোকটার কেমন সন্দেহ হল। ঘরের কোণে একটা ঝুলঝাড়া দাঁড় করানো ছিল, তার থেকে একটু রোঁয়া কেটে নিয়ে তাতে কালো রঙ মাখিয়ে বউকে বলল, 'এটা বুড়িকে দিয়ে এস।'

সেই রাত্তিরেই খট্ করে একটা শব্দ হতে লোকটার ঘুম ভেঙে গেল। তারপর দৃশ্যটা দেখে তার চোখটা প্রায় ঠেলে বেরিয়ে আসতে চাইল। সে দেখল, ঝুলঝাড়াটা যেন জ্যান্ত হয়ে ঘরের দরজা খুলে দৌড়ে পালিয়ে যাচ্ছে। আর সঙ্গে সঙ্গে দূরে শোনা গেল সেই ভয়ংকর হাসির শব্দ।

পরদিন সকালে মাটিতে ঝুলঝাড়ায় আঁচড় লক্ষ্য করতে করতে গ্রামের লোক সেই বুড়ির বাড়িতে এসে হাজির হল। বুড়ির চোখমুখ তখন রাগে লাল হয়ে ছিল। এত লোককে একসঙ্গে দেখে বুড়ি বেশ অবাক হল। পলকে মুখের ভাব পালটে ফেলে অমায়িক হেসে বলল, 'কি বাবারা সব, এত সকালে গরিবের কুঁড়েতে?'

গ্রামের লোক সব কথা বলতেই বুড়ি যেন আকাশ থেকে পড়ল। কিছুতেই কিন্তু স্বীকার করে না। শেষে ওঝা এসে মন্ত্র পড়ে বুড়ির গায়ে সরষে ছুঁড়তেই বুড়ি 'গেলুম গেলুম' হাঁক ছেড়ে ধোঁয়া হয়ে উড়ে গেল আর অনেক কচি গলার কলরব শুনে গ্রামের লোকে অবাক হয়ে দেখল আশেপাশে যত ঝোপঝাড় যেন কোন্ মন্ত্রবলে অদৃশ্য হয়ে গিয়েছে। সেখানে খেলা করছে অনেকগুলি কচি শিশু।

ক্লাসে অমলবাবু যখন বলেন গাছের প্রাণ আছে, তখন পাপুর এই গল্পটি ঠিক মনে পড়বে। ইস্কুলের জানলা দিয়ে সে প্রায়ই দেখে, অল্প হাওয়াতে সামনের দেবদারু গাছটা কেমন পায়রার মতন পিঠ চুলকায়, নারকেল গাছটা কেমন রাস্তার কুকুরের মতন ডাল নেড়ে মাছি তাড়ায় আর ঝাউগাছটা মাঝে মাঝে কেমন হাই তোলে। তবে কি ওরা ফিস্ ফিস্ করে কথাও বলে, সেই 'রাজার ছুটো শিং' বলা নিমগাছটার মতন।

এসব কথা ভাবার মতো অবস্থা অবশ্য পাপুর তখন ছিল না। ঝুড়ি হাতে বুড়িটা তার কাছে এসে ছানিপড়া চোখদুটো পাপুর মুখের কাছে এনে বলল, 'চেনা চেনা ঠেকছে মোত্তির বাড়ির পোলা না? কচু খাইছ ক্যান্? এসো দিকিন আমার সাথে।'

পাপু মন্ত্রমুগ্ধের মতো বুড়ির সঙ্গে চলতে লাগল। ভাবল, 'হায়রে, বাবা মা দিদি কেউ জানতেও পারবে না পাপুর কি হল। টপ্পা হয়ত বলবে। কিন্তু তখন পাপু কোথায় গাছ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকবে, কে জানে।'

এতক্ষণ ভয়ে যা করেনি, বাড়ির কথা ভেবে পাপু তাই করে ফেলল। ঝর ঝর করে সে কেঁদে ফেলল।

বাড়িতে পা দিয়েই বুড়ি হাঁকল, 'ও ভোলার মা, এক পলা সরষের তেল আর একটু পাকা তেঁতুল দাও তো।'

তলায় তলায় কলকাতা

জয়ন্ত দাশগুপ্ত

আমড়াতলায় রাতবিরেতে গাঁটকাটাদের ভয়
টাকার গন্ধ শুঁকতে পেলে ট্যাঁকটি খালি হয় ;
ভুলের ঝোঁকে টাকার শোকে করলে বাড়াবাড়ি
পাঠিয়ে দেবে কেওড়াতলা, যমদুয়ারে পাড়ি ;
কালীতলায় কালীপুজো দিতে যাবার কালে
কলাবাগান দেখায় কলা, পেলে তেমন তালে ;
তালতলাতে তাল খুঁজতে তালুই গেলো কাল
তালবেতালে পিঠের ওপর তুললো বিষম তাল ;
নিমতলাতে নিমের হাওয়া খেতে যদি চাও
জ্যান্ত যদি ফিরতে পারো, কপাল জেনো তাও ;
বকুলতলার উকিল বাবুর গন্ধে ভারি ভয়
নাকতলাতে নাকটি টিপে পালিয়ে বেঁচে রয়,
বেলতলাতে বেল (ঘণ্টা) কিনতে গেলে ভুলে
ঘণ্টাকর্ণ টানলে কর্ণ, ভুগবে খোসে খুলে,
তলায় তলায় সব তলাতেই তাল পাকানো জট
তালে তালে তাল না দিলে দুরন্ত ঝঞ্ঝট ।

ভেতর থেকে একটা বউ তেল আর তেঁতুল হাতে নিয়ে বেরিয়ে এল। সঙ্গে একটা ছোট ছেলেও এল।

ছেলেটা বুড়িকে জিজ্ঞেস করল, 'এ কে নানী ?'

বুড়ি বলল, 'বামুন বাড়ির পোলা। খেলা করতে করতে কচু গিলেছে। পোলাপানের কাণ্ড !'

ভোলা নামে ছেলেটা হি-হি করে হেসে প্রায় গড়িয়েই পড়ল। তাই দেখে পাপুর ভয়ানক রাগ হল। এরকম বেগতিক অবস্থায় না পড়লে সে ভোলাকে ঠিক শিক্ষা দিত।

তেঁতুল আর তেল গিলে পাপুর প্রায় বমি আসতে লাগল। তবে মুখের আর গলার জ্বলুনিটা অনেক কমেছে বুঝতে পারল।

কিছুক্ষণ পরে ভোলার বাবা আসতে তাকে দিয়েই বুড়ি পাপুকে বাড়ি পৌঁছে দিল।

বাড়ির দরজার কাছে এসে পাপু দেখে অনেক লোক দাঁড়িয়ে। তার বাবা, মা, দিদি, লক্ষ্মণদা ছাড়াও হারুদা, মধুকাকা, মীরাদি—সব। এমনকি ধীরুমামা, হরির মা—এদেরও দেখতে পেল। মাঝখানে টপ্পা হাত-পা নেড়ে কি সব বলছে। বাবা টপ্পাকে বলছেন, 'চল্ তো আমার সঙ্গে সেখানে।'

ঠিক এমন সময় ভোলার বাবার সঙ্গে পাপু বাড়িতে ঢুকতেই সবাই একসঙ্গে 'ঐ তো পাপু' বলে হৈ চৈ করে উঠল।

বাবা ভোলার বাবাকে বললেন, 'কি ব্যাপার সিরাজুল? পাপুকে তুমি কোথায় পেলে?'

ভোলার বাবা সব ঘটনা বলতে সবাই একসঙ্গে হো হো করে হেসে উঠল।

শুধু বাবা বললেন, এরপর থেকে আমি দুপুরের পড়া আর অঙ্ক দিয়ে যাব। বাড়ি এসে দেখব। কখনও যেন না শুনি যে দুপুরে বাড়ির বাইরে পা দিয়েছ।'

বাবা তখন বেশ কিছুদিনের ছুটি নিয়ে বাড়িতে আছেন।

এত লোকের সামনে বাবা এমন করে বলাতে অভিমানে পাপুর চোখ ছলছল করে উঠল।

রাত্তিরে বিছানায় শুয়ে ভাবল, এর চাইতে সে গাছ হয়ে গেলেই ভালো হত। তখন তার জন্যে সকলের কেমন কষ্ট হত তাই ভাবতে ভাবতে তার নিজেরই চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে বালিশে টপ টপ করে পড়তে লাগল।

(৩)

পরদিন সকাল গেল, দুপুরও গড়িয়ে চলল। টপ্পার দেখা নেই। পাপুও ওর কাছে যায়নি। তার খুব রাগ হয়েছিল টপ্পার ওপর, তাকে একরকম বিপদে ফেলে পালানোর জন্যে। দুপুরে বাবার দেওয়া অঙ্ক আর ট্রানস্লেশন শেষ করে পাপু চুপচাপ চিৎ হয়ে খাটে শুয়ে ছিল। মা আর দিদি দুজনেই পাশের ঘরে ঘুমোচ্ছে।

শুয়ে শুয়ে পাপু দেখছিল, দেয়ালের যে জায়গাটায় চটা উঠে গিয়েছে সেটাকে ঠিক মহাত্মা গান্ধীর মতো দেখা যাচ্ছে। আবার উল্টোদিক থেকে মনে হচ্ছে একটা ফুলদানি।

ঠক্ ঠক্ ঠক্।

টেলিফোনের সংকেত আসতেই পাপু সব রাগটাগ ভুলে গিয়ে ফোন ধরল।

'হ্যালো, পাপু। টপ্পা বলছি। জেল খাটা শেষ? আমি যাচ্ছি তোর কাছে। রাখলাম।'

কিছুক্ষণের মধ্যেই হাঁপাতে হাঁপাতে টপ্পা এসে হাজির।

বলল, 'আমারই ভুল হয়েছিল। বুড়ির পায়ের দিকে তাকাইনি। ডাইনির পায়ের পাতা যে উল্টোদিকে থাকে সে কথাটা সকলেই জানে আর তুই সেটা বুঝলি না?'

সব দোষ পাপুর ওপর চাপিয়ে টপ্পা খাটে শুয়ে পড়ল।

তারপর হাই তুলতে তুলতে বলল, 'এই, তুই তো বেশ ভালো সাঁতার কাটতে পারিস। আমাকে শিখিয়ে দিবি?'

এই প্রথম একটা বিষয়ে টপ্পা পাপুর শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করাতে পাপুর খুব আনন্দ হল। সে সোজা হয়ে বসল।

বলল, 'সাঁতার শেখাটা খুব কিছু না। প্রথমে অনেকদিন ধরে শুধু ঘাটের পৈঠা ধরে পা ছুঁড়ে যেতে হবে। এইরকম করতে করতেই একদিন দেখবি শরীরটা হাল্কা হয়ে জলে ভেসে উঠছে। কাল

থেকেই আরম্ভ করে দিস্। তবে আরো তাড়াতাড়ি শিখবি, যদি পিঁপড়ে খেতে পারিস্।'

টপ্পা নাক কুঁচকে বলল, 'পিঁপড়ে খাব? পিঁপড়ে তো সাঁওতালরা খায়। ওসব পারব না।'

পাপু বলল, 'দূর বোকা, পিঁপড়ে কি আর ধরে ধরে কচমচ করে চিবিয়ে খাবি? রোজ সরবৎ খাবি। তার মধ্যেই দেখবি লাল পিঁপড়ে মরে থাকবে। সবসুদ্ধু ঢক্ ঢক্ করে খেয়ে ফেলবি। খেতে খারাপ লাগবে না রে। বেশ লজেন্সের মতো টক টক স্বাদ।'

এত লোভ দেখাতেও পিঁপড়ে খেতে টপ্পার খুব একটা আগ্রহ দেখা গেল না।

সে বলল, 'আমার তাড়াহুড়ো কিছু নেই।'

একটু চুপ করে থেকে বলল, 'আমার মনে হয়, রামসীতারা শুধু জামরুল আর করমচাই খেত।'

পাপু একবার ঘাটশিলা গিয়েছিল। রাত্তির বেলা রেলগাড়ি থেকে দুপাশে কালো কালো গাছপালা দেখে তার কেন যেন মনে হয়েছিল, এটাই দণ্ডকারণ্য। ক্লাসে অনেককে সে কথা বলেছেও। কেউ অবিশ্বাস করে নি।

টপ্পাকে সে কথা বলতেই টপ্পা হো হো করে হেসে বলল, 'দূর! দণ্ডকারণ্য এখানে কোথায়? সে তো ভারতবর্ষের একেবারে শেষে, আফ্রিকার কাছে।'

আফ্রিকা সম্বন্ধে পাপুর খুব একটা ধারণা না থাকলেও ঘাটশিলাকে 'এখানে' বলাতে পাপুর খুব রাগ হল। সে ভাবল, টপ্পা যতই বলুক, সে ঠিক জানে দণ্ডকারণ্য ঘাটশিলার কাছেই কোথাও হবে। বাদামতলার বিল পার হলেই হয়ত সেখানে যাওয়ার একটা সোজা রাস্তা আছে। কেউ যায় না বলেই জানে না। সে যদি বাবার মতো বড় হত, তবে ঠিক বাদামতলার বিল পার হয়ে ঘাটশিলা যাওয়ার রাস্তাটা আবিষ্কার করে ফেলত।

বিকেলে টপ্পার সঙ্গে মাঠে খেলতে গিয়েও পাপুর মনের মধ্যে সেই কথাটাই ঘুরে ফিরে বেড়াতে লাগল। সন্ধ্যেবেলা বাড়ি ফেরার সময় পাপু বলল, 'তবে কি তুই বলতে চাস্ এদিকে সোজা হাঁটলে ঘাটশিলায় যাওয়া যায় না?'

টপ্পা এক মিনিট কি ভাবল। তারপর বলল, 'এটা হচ্ছে পশ্চিমদিক। তবে তো এদিকে হাঁটতে থাকলে আমেরিকায় গিয়ে পৌঁছব।'

পাপু এবার ক্ষেপে গেল। সে হারুদার কাছে শুনেছে, আমেরিকা পৃথিবীর উল্টো পিঠে। মাটিতে যদি সোজা গর্ত খুঁড়ে যাওয়া যায়, তবে তার ভেতর দিয়ে আমেরিকায় যাওয়া যায়। সেলিমদের বাড়িতে কুয়ো খোঁড়ার সময় একবার সে ভেতরে তাকিয়ে দেখতে গিয়েছিল, কিন্তু সবাই হৈ হৈ করে তাকে সরিয়ে দিয়েছিল।

সে জোরের সঙ্গে বলল, 'মোটেই না, আমেরিকা পৃথিবীর উল্টো দিকে।'

টপ্পা বলল, 'তুই বেশি জানিস? আমেরিকা পশ্চিম দিকে।'

অনেকক্ষণ ধরে তর্ক চলল। টপ্পার গলার জোর অনেক বেশি। তার কাছে পাপুর গলা প্রায় শোনাই যাচ্ছিল না।

রাগে দুঃখে পাপু টপ্লার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে তাকে খামচে খামচে অস্থির করে তুলল।

'সাগ্নিক! দেবব্রত! মারামারি করছ কেন?'

মাঠের মধ্যে হঠাৎ হেড স্যারের গলা শুনে দুজনেই তড়াক করে লাফিয়ে উঠল। হেড স্যারের পরণে হাফপ্যাণ্ট, হাতে দড়িবাঁধা রেফারির বাঁশি। পেছনে উঁচু ক্লাসের অনেক ছেলে। সবাই ফুটবল খেলে ফিরছে।

হেডস্যার বললেন, 'যাও, দুজনে বাড়ি চলে যাও। সন্ধ্যে হয়েছে।'

দুজনে একসঙ্গে একই রাস্তায় বাড়ি ফিরছিল। কিন্তু কারো মুখে কোন কথা ছিল না। সে রকম অসহ্য অস্বস্তি পাপু আর কোনদিন কোন ব্যাপারে পায় নি। হয়ত টপ্লাও সেকথাই ভাবছিল। পথের পাশের গাছগুলোর যদি অনুভব শক্তি থাকত, তবে তারা নিশ্চয় অভিমানভরা এই দুই বালক হৃদয়ের বেদনায় সমব্যথী হয়েছিল সেদিন।

কতদিন কেটে গিয়েছে তারপর। তবুও সেদিনের কথা পাপু কোনদিন ভোলেনি। এমন কি সেদিন যে মঙ্গলবার ছিল, সেদিন যে বাড়িতে মা খিচুড়ি রান্না করেছিলেন—সব কথা মনে আছে।

কারণ সেদিনই টপ্লার সঙ্গে তার প্রথম কথা বন্ধ। এর পরে আরেকবার শেষবারের জন্যে যে কথা বন্ধ হয়েছে, সেটা তাদের ভাগ্যের নিষ্ঠুর হাতে। তারপর আর তাদের ভাব করার সুযোগই হয়নি। পাপু তখন বেলপুকুর ছেড়ে, এমন কি বাংলা দেশ ছেড়েও চলে গিয়েছে অনেক দূরে।

[ক্রমশঃ]

ছোট্ট ছড়া

বারীন বসু

রবিবারে ছুটি তাই
গুপী রূপী দুই ভাই
 চলেছে মামার বাড়ি সালকে,
মাঝ পথে চুপি চুপি
গুপী বলে ওরে রূপী
 শুনি নাকি সোমবার কালকে?

ষাঁড়ের নেমতন্ন

বাণী রায়

ষাঁড় ঘণ্টাকর্ণ বেজায় মোটা হয়ে গেছে। থপ্‌থপ্‌ করে সে হাঁটে, তাড়াতাড়ি নড়াচড়া করতে পারে না। ডাক্তার বলে দিয়েছে মিষ্টি জিনিস না খেতে, কারণ ষাঁড়ের চর্বি খুবই বেড়েছে। কিন্তু ষাঁড় লোভী, মিষ্টি খাবার জন্য নোলা সক্‌সক্‌ করে।

বিশেষ করে 'পিপ্‌' খেতে ষাঁড় ভারী ভালবাসে। 'পিপ' মানে পিপারমিণ্ট ও টফি। ছুটো মিলিয়ে ফেলে ছেলেবেলায় কৌশিকসোনা 'পিপ্‌' বলত। ওর কাছ থেকে মধ্যে মধ্যে টফি বা পিপ্‌ খেত ষাঁড়।

আজ সকালবেলায় ষাঁড় দাঁড়িয়ে আছে কৌশিকসোনার গাড়ীবারান্দার সম্মুখে, উর্ধ্বমুখ হয়ে। এমন সময়ে বাঘ সেইপথ দিয়ে যেতে জিজ্ঞাসা করল, 'কি ভাই, তুমি এখানে চুপচাপ দাঁড়িয়ে কি করছ?'

ষাঁড় উত্তর দিল, 'আমি বড় পিপ্‌ খেতে ভাল বাসি। তাই দাঁড়িয়ে আছি, কৌশিকসোনা বারাণ্ডায় এলে একটা ছুটো পিপ্‌ চেয়ে নেব।'

বাঘ হা-হা করে হেসে বলল, 'এই কথা? পিপ খেতে চাও? আমি তোমাকে পিপ খাওয়াবো। একটা ছুটো নয়, যত খেতে চাও। এর জন্যে এখানে এতক্ষণ ধরে দাঁড়িয়ে আছো! আহা, মরে যাই।'

ষাঁড় খুসি হয়ে উঠল, 'বেশ তো তুমি খাওয়ালে আরও তো ভাল। বেশ তো খাওয়াও।'

বাঘ বলল, 'কিন্তু ভাই, তুমি একা খাবে কেন? তোমার সমাজের বন্ধুবান্ধব, আত্মীয়স্বজন সবাইকে নেমতন্ন করে তোমার বাড়িতে নিয়ে যাও। আমি চান-টান সেরে পিপ্‌ নিয়ে আসছি।'

ষাঁড় মহা আহ্লাদে পথে যেতে যেতে যত ষাঁড় বাছুর, গরু, বলদ দেখল, তাদের বলল, 'ভাই, আমার বাড়ি তোমার নেমতন্ন। তাড়াতাড়ি এসো।'

বাড়ি ফিরে ষাঁড় তার ছেলে বাচ্চা ষাঁড়কে বলল, 'ওরে, জায়গাপত্তর কর, সবাই আমাদের বাড়ি খেতে-দেতে আসবে। বাঘ আমাদের পিপ এনে দেবে।'

বাচ্চা ষাঁড় বলল, 'কিন্তু বাবা, বাঘ যদি হালুম দেয় তবে কি হবে?' ('হালুম দেওয়া' মানে হালুম করে তেড়ে আসা) 'আরে, না না, বাঘ আমাদের বন্ধু. সে কি তা পারে?'

বাচ্চা ষাঁড় চুপ করে গেল।

তারপরে ছুই বাবা ও ছেলে মিলে মাটির উঠোন গোবরজল দিয়ে নিকিয়ে পরিষ্কার করল। সারি সারি কুশাসন পাতা হল সেখানে। ধামা ভরে ভরে ছু'জনে বেল, পেঁপে, কলা, আতা, সপেটা, আপেল সাজিয়ে রাখল। মাটির গেলাস ধুয়ে জল ভরে রাখল। কলাপাতা বিছিয়ে দিল।

ক্রমে ক্রমে এক এক করে ষাঁড়, বলদ, গরু সকলে এসে হাজির নেমন্তন্ন বাড়ি। ষাঁড় ও বাচ্চা

ষাঁড় তাদের খেতে বসিয়ে দুজনে মিলে খামার ফল পরিবেশন করতে সুরু করল :

এধারে মস্ত এক ঝোলা কাঁধে ঝুলিয়ে নামাবলী গায়ে বাঘ এসে হাজির।
'আমি গঙ্গা স্নান সেরে এলাম। জয় হরি, রাধাকৃষ্ণ! ভাই ষাঁড়, তুমি আর তোমার ছেলেও বসে যাও, পাশে আমার পাতা রেখে। আমি পিপ্ পরিবেশন করে বসছি।'

ষাঁড়েরা তাই করল।

বাঘ তখন থলের মধ্য থেকে একটা করে টফি সকলের পাতায় দিয়ে বলল, একটা দিয়ে আরম্ভ করলাম। সবাই খেতে সুরু কর। পরে আরও দেব। জয় গৌর!'

ব্যস্! যেই টফিটি মুখে ছোঁয়ানো, অমনি যে-যার স্থানে ঢলে পড়ল। কারণ টফির মধ্যে বিষবড়ি ছিল, সেটি খেলে একদম প্রাণ না গেলেও সকলে অজ্ঞান হয়ে পড়বে।

ব্যাপার দেখে বাচ্চা ষাঁড় পাতা ছেড়ে প্রকাণ্ড একটা ধানের মরাইর আড়ালে লুকিয়ে পড়ল। সে পরে খাবে বলে টফিটা মুখেও তোলেনি।

তখন বাঘ থলে থেকে ধারালো কাঁচি বার করে একে একে সবার ল্যাজটি কেটে নিয়ে মনের আনন্দে নাচতে নাচতে উধাও।

টালিগঞ্জ পুলের নীচে শেয়ালের একটা ল্যাজ কেনাবেচার দোকান ছিল, সেখানে চড়া দামে ল্যাজগুলো বিক্রি করে দিয়ে আউটরাম ঘাটে লঞ্চ ভাড়া করে বাঘিনী ও ছানাদের নিয়ে বাঘ সুন্দরবনে হাওয়া খেতে উধাও। শহরে বাস করে করে তারা বিরক্ত হয়ে গেছে।

এদিকে বাঘ চলে গেলে ষাঁড়ের বাচ্চা কাঁদতে কাঁদতে অজ্ঞান, ল্যাজকাটা বাবার কাছে এল।

উঠোনের কুয়ো থেকে জল তুলে ঘটি করে সে বাবার মাথায় দিয়ে 'বাবাগো, বাবাগো' বলে কাঁদতে লাগল।

জল ঢালার পরে ষাঁড়ের জ্ঞান ফিরে এল। সে 'একি, আমি কোথায়?' বলে চোখখুলে উঠে বসল।

ছেলে কঁদতে কাঁদতে বলল, 'বাবাগো, তোমাদের বিষবড়ি দিয়েছে। অজ্ঞান হয়ে পড়লে তোমাদের ল্যাজ কেটে নিয়ে গেছে। এই ছাখ বাবা, তোমাদের ল্যাজ নেই।'

তাই দেখে ষাঁড় 'হায় ভগবান, কি লজ্জা, কি ঘেন্না। ল্যাজ ছাড়া আমি মুখ দেখাব কেমন করে?' বলে আবার জ্ঞান হারাল।

তখন বাচ্চা আবার জল ঢেলে বাবার জ্ঞান ফেরাল।

দু'জনে মিলে কুয়ো থেকে জল তুলে অন্যান্য ষাঁড়দের গরুদের মাথায় ঢেলে তাদের সুস্থ করে তুলল।

তারাও তখন প্রকৃত ব্যাপার শুনে এবং নিজেদের ল্যাজ নেই দেখে হায় হায় করে উঠল।

'এখন কি করা যাবে? বাঘের বাড়ি চল।'

দল বেঁধে বাঘের বাড়ি যেয়ে দেখে কেউ নেই। দরজায় মস্ত গড্‌রেজের তালা।

ঘণ্টাকর্ণ বলল, 'চল কৌশিকসোনার কাছে যাই। তাদের পুষির ল্যাজ কাটা গিয়েছিল। কৌশিক সোনা ডাক্তার দিয়ে লাগিয়ে দিয়েছিল বেমালুম। সে সাহায্য করতে পারবে আমাদের।'

সকলে তখন কৌশিকসোনার বাড়ির ফটকে ভিড় জমাল! কৌশিক সমস্ত কথা শুনে বলল, 'তাইতো, এতগুলো ল্যাজ! আগে ল্যাজগুলো শেয়ালের কাছ থেকে আদায় করে আনো তারপরে আমাদের ডাক্তারবাবুকে দিয়ে আমি লাগিয়ে দিচ্ছি। এটা শ্লোগানের যুগ। শেয়ালের দোকানের সামনে শ্লোগান দাও।'

তাই শুনে সেই সারি সারি ল্যাজকাটা ষাঁড়-গরু-বলদ-বাছুর শেয়ালের দোকানের সম্মুখে হানা দিল। বাস গাড়ী বন্ধ করে পথের বুকে সবাই সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে তারস্বরে চীৎকার লাগাল, 'ল্যাজ চাই, আমাদের ল্যাজ ফেরৎ চাই। আমাদের দাবী মানতে হবে। জয় হিন্দ।'

ব্যস্, লোকে লোকারণ্য। ষাঁড়গরুর মিছিল দেখতে লোক থৈ-থৈ। ছুটে ছুটে লোক আসতে লাগল। দমকল পুলিশ বাহিনী সকলে হাজির।

শিয়াল দারুণ ভয় পেয়ে সুড়্ সুড়্ করে সবগুলো ল্যাজ বার করে দিল!

তারপর কৌশিকসোনার ডাক্তারবাবু সমস্ত ল্যাজগুলো যুড়ে যুড়ে সেলাই করে দিলেন। ঠিক আগের মত।

কী আনন্দ তখন সকলের!

জলসার জ্বালা

অমৃত লাল পাঁজা

এক যে ছিল শেয়াল
গহন বনে
আপন মনে
গাইত বসে খেয়াল।

বাঘ যে তারই মামা
হেলে দুলে
লেজটি তুলে
বাজাত এক ধামা।

বিড়াল বাঘের মাসী
গাছের ডালে
তালে তালে
বাজাত এক বাঁশী।

গুড়-গুড়-গুড়্ তাক
উঠলে মেঘের ডাক
ডালটা নড়ে,
বিড়াল পড়ে।
ভাঙল বাঘের নাক।

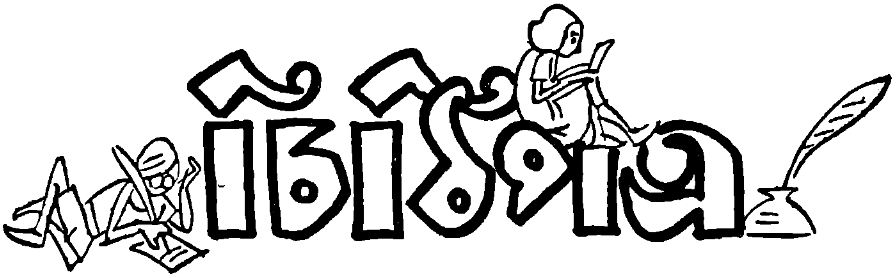

(১) ১০০৪ **পার্থপ্রতিম ও সিদ্ধার্থ প্রধান,**—
১১ ও ৯ বছর

ভাদ্র মাসের সন্দেশ পেতে একটু দেরী কেন হল এবার বুঝেছ ত?

ভাদ্র-আশ্বিনই যে পুজো সংখ্যা। ভাল লেগেছে তো?

প্রোফেসর শঙ্কুকে আমরাও খুঁজে বেড়াচ্ছি—দেখি, কবে খোঁজ পাই। শুভ বিজয়ার চিঠি পেয়ে সুখী হলাম। স্নেহাশীর্বাদ জেনো।

(২) ১৩৪৪, **রিণ্টু ও জুঁই**—১৪ ও ৯ বছর

সন্দেশ আমরা পাঠাই প্রত্যেক বাংলা মাসের মাঝামাঝি, ইংরেজি হিসেবে মাসের একদম শেষে; খেয়াল রেখো।

তোমাদের বন্ধুদের যখন সন্দেশ ভাল লেগেছে, তাদেরও গ্রাহক হতে বল না। 'নিয়মাবলীতে' সব নিয়ম জানতে পারবে।

(৩) ৬০৪ **শংকর চট্টোপাধ্যায়,**—১৩ বছর

সন্দেশের জন্ম বৈশাখ ১৩২০তে। দিন তো ঠিক জানি না। তখন লীলা মজুমদার খুবই ছোট ছিলেন, আর অন্য সম্পাদকদের জন্মই হয়নি। প্রতিষ্ঠাতা উপেন্দ্রকিশোর রায় ছিলেন লীলা মজুমদারের জেঠামশাই, নলিনীদাশের দাদামশাই আর সত্যজিৎ রায়ের ঠাকুরদাদা।

মোগল বাদশাদের বিষয়ে ভাল প্রবন্ধ পেলেই ছাপানো হবে।

(৪) ১৭৪৩ **সর্বানী মজুমদার,** (বয়স?)

গ্রাহক কার্ড তো পাঠিয়েছি, পাওনি? পেনসিলে ছবি আঁকলে তো ছাপা যাবে না ভাই, এর পরে কালো কালিতে ছবি এঁকে পাঠাও।

(৫) ১৫৬৯ **ইন্দ্রাণী মুখোপাধ্যায়,** ১৫½ বছর

পত্রবন্ধু চাই। শখ—গল্পের বই পড়া, (বাংলা ও ও ইংরেজি), গান গাওয়া, ও শোনা, আর ঘুরে বেড়ানো (বাঃ, চমৎকার শখ।)

(৬) ১৩৮১, **নীলাঞ্জন চট্টোপাধ্যায়,** ১৪ বছর—

প্রোফেসর শঙ্কুর নামে ঘন ঘন চিঠি আসছে, তবু সাড়া নেই, ব্যাপার কি? অজেয় রায়ের 'বদলা'ই 'আলো' হয়েছিল। এবার সত্যিই তাঁর উপন্যাস পাবে।

প্রকৃতি পড়ুয়ার দপ্তরের জন্য জীবন সর্দারকে চিঠি লেখো। তোমাদের কাছ থেকে প্রতি মাসে কয়েকশ' করে লেখা আর ছবি আসে তাই দেখতে দেখতে দেরী হয়ে যায়।

সত্যি এবার পাটনায় সাংঘাতিক বন্যা হল! আমরা সর্বদাই পাটনাবাসী গ্রাহক আর লেখকদের কথা চিন্তা করতাম।

নিউস্ক্রিপ্টের বইএ ১০% কমিশন থাকে। কি বই চাও, জোড়া পোস্টকার্ডে লিখো, দাম ও পাঠাবার খরচ কত জানিয়ে দেবো।

(৭) ২১৬২ **সত্যশ্রী উকিল** (বয়স?)

সম্পাদকমশাই তো ইদানীং বহুদিন কলকাতায় ছিলেন না, এমন কি ভারতবর্ষেও ছিলেন না। দেশে ফিরবার পর সম্প্রতি তোমার চিঠি তাঁর কাছে পাঠানো হয়েছে।

তুমি কখনও খুব ভালো অভিনেতার অভিনয় দেখোনি? বৃদ্ধের ভূমিকায়-তো কম বয়সী অভিনেতারাই

করেন, আবার তাঁরাই যুবকের ভূমিকায়ও অভিনয় করেন। চেহারা, গলার স্বর এমন বুড়োর মতন করেন যে পাদপ্রদীপের উজ্জ্বল আলোতেও হাজার দর্শকের ধোঁকা লেগে যায়। ফেলুদা তো অচেনা লোককে দেখেছিল আধা-অন্ধকারে, মোমবাতির আলোয়, কম্বল ঢাকা অবস্থায়।

(৮) ২৪২০ গায়ত্রী দত্ত, ১৫ বছর

বাঃ, তোমরা তো নর্মদা নদীর তীরে সুন্দর হোসাঙ্গাবাদে গেছ। তার কাছাকাছি অনেক দেখবার জিনিস আছে। এমন কি ঐতিহাসিক গুহাচিত্র আছে। খুব বেড়াচ্ছ।

তোমার আঁকা সুন্দর কার্ড পেয়ে খুব খুশি হয়েছি। মানুষের ছবি আঁকা খুব কঠিন, বিশেষতঃ সত্যি মানুষের ছবি বা পোর্ট্রেট। সত্যজিৎ রায় নিজে খুব ভালো আঁকেন, কিন্তু তিনি তো আঁকা শেখান না, সে বিষয়ে লেখেনও না।

শারদীয়া সংখ্যা ভাল লেগেছে জেনে সুখী হলাম। সত্যি, কালু-মালু-বুলু-টুলু দেখছি গত পনের বছর ধরে একই স্কুলে পড়ছে। বয়স বাড়ে না ওদের!

(৯) ২১৮৮ মহুয়া সেনগুপ্ত, ১৬ বছর ১০ মাস।

শারদীয়া সংখ্যা ভালো লেগেছে জেনে আমরাও খুশি। এবার একটা বিশেষ কারণে দশজন প্রধান সাহিত্যিকের পরিচিতি দেওয়া হয়েছে তা মনে আছে তো? এঁরাই শিশু-সাহিত্য পরিষদের কাছে গত বছর বিশেষ সম্বর্ধনা পেয়েছিলেন।

'খাই খাই' অংশের পরিকল্পনা (layout) করেছেন শ্রীমান সন্দীপ রায়। কিন্তু ছবিগুলি নতুন নয়। মূল 'খাই খাই' বই থেকে শ্রীসত্যজিৎ রায়ের আঁকা ছবিই নেওয়া হয়েছে।

এই বিভাগে তোমাকে লেখা আমাদের এটাই হয়তো শেষ চিঠি। ব্যক্তিগত চিঠি তুমি এর পরেও লিখতে পারবে কারণ, তার তো আর কোন বয়সের সীমা নির্ধারিত নেই।

(১০) ১০৪৮ শ্রাবণী মুখোপাধ্যায়, ১৫ বছর—

হাত পাকাবার আসরে এত বেশি সংখ্যায় লেখা আর ছবি আসে যে বিচার করতে বিলম্ব হয়। ফলাফলের অপেক্ষা না করেই লেখা আর ছবি পাঠিয়ে যেও।

শারদীয়া সংখ্যা কিন্তু 'ছোট' হয় নি, মানে পৃষ্ঠা সংখ্যা কমেনি। পত্রবন্ধু চাই শখ—বই পড়া, অভিনয় আর আবৃত্তি করা, ছবি আঁকা রুমাল কেনা আর রান্না করা। (বাঃ, পত্রবন্ধুরা তোমার বাড়ি এসে তোমার হাতের রান্না চাখতে চাইবে।)

(১১) ২৭৭০ সৌমিত্র মুখোপাধ্যায়, ১৬ বছর

না-না, তোমার গ্রাহক সংখ্যা বদলায় নি, ছাপাখানার ভূতের বোধ হয় ইংরেজি আর বাংলা সংখ্যা গুলিয়ে গেছে, তাই তুমি ২৯৯০ (2990) হয়ে গেছ!

(১২) মধুলেখা ও মালবিকা চৌধুরী ১৩ বছর।

পুজো সংখ্যা ভালো লেগেছে জেনে আমরাও খুশি। পাত্রপাত্রী, ঘুরঘুটিয়ার ঘটনা, প্রেতসিদ্ধের কাহিনী, ভেটো আর রাগী দাদাবাবু, ভেলকিরাম,—এগুলি অনেকেরই ভালো লেগেছে। পুণ্যলতা চক্রবর্তীর 'নতুন লেখা' নেই, পুরোন সন্দেশ থেকেই ওটাও নেওয়া। সুকুমার রায়েরও অপ্রকাশিত কোন লেখা নেই। দু-একটা ধাঁধা একটু কঠিন না দিলে আবার অনেক গ্রাহক নালিশ করে যে ধাঁধা বড্ড সোজা হচ্ছে, মাথা ঘামাতে হয় না।

(১৩) নীলাম্বর দাস, হরগোবিন্দপুর প্রাইমারি স্কুল, ১২ বছর।

লিখতে লিখতেই তো লিখতে শেখে, তারপর আরো ভালো লিখতে শেখে। এর কোন সহজ নিয়ম নেই।

না ভাই, কোন লেখকের ঠিকানা আমরা জানাই না। তবে, আমাদের কাছে চিঠি লিখলে রিডাইরেক্ট করে পাঠিয়ে দেব। সন্দেশের সম্পাদক প্রকাশকেরা সকলেই তো পুণ্যলতা চক্রবর্তীর আত্মীয় (৬০৪ শংকর চট্টোপাধ্যায়ের চিঠি দেখো)—কারণ পুণ্যলতা ছিলেন উপেন্দ্রকিশোর রায়ের মেয়ে। সন্দেশ কেন বন্ধ হবে? আমরা খুব চেষ্টা করব যাতে কোনদিন বন্ধ না হয়।

(১৪) ১৬১৬, দাপ্যমান ও অম্লান রায়, ৯ ও ৮ বছর।

গ্রাহক কার্ড তো পাঠিয়েছি—পাও নি? শারদীয়া সংখ্যা ভালো লেগেছে বলে খুশি হলাম।

(১৫) ৫১০, সুজয় ও সংযুক্তা সোম—১৬ ও ৭½।

খেলা সম্বন্ধে ভালো উপন্যাস পেলে নিশ্চয় ছাপবো। নানা কারণে আমরা অনির্দিষ্ট বিষয়ে গল্প বা কবিতা লেখার প্রতিযোগিতা দিতে চাই না, বিষয় নির্দেশ করে দিই।

আষাঢ় সংখ্যার 'বামন খুড়ো' কিন্তু নিছক গল্প নয়। সত্যি যদি 'বামন খুড়ো' সেজে বন্ধুদের ধোঁকা দিতে পার, তবেই লেখাটার মজা বুঝবে।

তোমাদের পাঠান ধাঁধার উত্তর একটু দেরীতে পেলাম বলে কার্ত্তিক সংখ্যায় নাম বের করা গেল না।

(১৬) ৭৫৯, কৃষ্ণা সরকার, ১৫ বছর

আমাদেরও সন্দেহ যে প্রোফেসর শঙ্কু কোন সাংঘাতিক গবেষণার কাজে ব্যস্ত আছেন। হয়তো বা বিদেশ গেছেন, আশা করি শীঘ্র ফিরবেন।

সত্যজিৎবাবু সন্দেশকে এত ভালবাসেন যে রাত জেগেও কাজ করেন।

(১৭) ৬৮৪, সুজন দত্ত, ১৩ বছর

ওরে-ব্বাস—তুমি যে অসংখ্য প্রশ্ন পাঠিয়েছ! কয়েকটার উত্তর জানাচ্ছি শ্রীউষাপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায় অধ্যাপক। শ্রীঅজয় হোম অনেক খেলা দেখেন। অবশ্য রিলেও শোনেন। শ্রীসত্যজিৎ রায়ের জন্ম ২।৫।১৯২১ আর শ্রীযুক্তা লীলা মজুমদারের ২৬।২।১৯০৮ তোমার লেখাগুলি পেয়েছি, সুবিধা মতন দুচারটি অন্ততঃ ছাপাব। বিখ্যাত কবিদের সম্বন্ধে ভালো লেখা পেলে নিশ্চয় ছাপাব।

(১৮) ১৬২৩, অনির্বাণ মুখোপাধ্যায়, ১১½ বছর।

লেখা ছাপা হয়নি বলে মন খারাপ করো না, আরো ভাল করে লেখো। লিখতে লিখতে হাত পাকালে নিশ্চয় লেখা ছাপা হবে।

(১৯) ১৫৯৭ প্রহেলী আসরের সভ্য ভাইবোনেরা

তোমাদের শারদীয়া সন্দেশ এত ভাল লেগেছে জেনে সুখী হলাম তোমরা বিশেষভাবে লিখেছ ঘুরঘুটিয়ার ঘটনা, শেয়াল কাঁটার ফুল, চুরি ধরার এক বিচিত্র কাহিনী, মানসযাত্রা, পাত্রপাত্রী, বুনো-কুনো, ঘুরি, মামার বাড়ি, চিঠির প্রাণ, পড়ার নামতা আর মামার বাড়ির কথা। আরো অনেক গ্রাহকের এগুলি ভাল লেগেছে।

লেখক বা গ্রাহকদের ঠিকানা আমরা জানাই না, তাঁদের কার্যালয়ের ঠিকানায় চিঠি লিখো, রিডাইরেক্ট করে দেব।

(২০) ১৫১৭, ত্রিবিধ দাস, ১৬ বছর

পত্রবন্ধু চায় :—শখ ফুটবল খেলা, দাবা খেলা, গল্পের বই পড়া, ভ্রমণ করা আর পত্রবন্ধুকে ভালবাসা। অনেক দূরের গ্রাহকেরা তার পত্রবন্ধু হও।

(২১) ১৪৪২ অতীশ নন্দী, ,১১½ বছর

তোমার জ্যৈষ্ঠের ৪নং ধাঁধার উত্তর অসম্পূর্ণ ছিল। তুমি ঠিকই লিখেছিলে যে ইন্দ্রনীল ১৬½ বছর বয়সে সাইকেল পাবে, কিন্তু সেটা কবে তার সাল-তারিখ লেখনি।

আরো মন দিয়ে ধাঁধা গুলি পড়লে তুমি সব কটি ঠিক উত্তর দিতে পারবে।

তুমি বোধহয় চাঁদা পাঠাবার সময়ে গ্রাহক নম্বর জানাও নি, তাই নতুন নম্বর বসে গেছিল, ঠিক করে দিলাম।

তুমি আরো লেখা তার ছবি পাঠাও, ছাপা না হলে দুঃখ করো না। লিখতে লিখতেই লেখা আরো ভাল হবে।

(২২) ২০৭, প্রিয়দর্শী ও সুপ্রতীক মুখোপাধ্যায়, (বয়স?)

তোমাদের ধাঁধার উত্তর একটু দেরীতে পাওয়া গেছিল, তাই নাম ছাপতেও দেরী। অনেক লেখা অনেক ছবি জমে গেছে ভাই, তাই তোমাদের লেখা এখনও মনোনীত হয়নি।

(২৩) ১৬৩৪, সুমনা চৌধুরী, ১৩ বছর

তোমার চিঠি ও শুভকামনা পেয়ে সুখী হলাম। স্নেহাশীর্বাদ জেনো।

(২৪) ১২০২, রূপালী বেগম ৬½ বছর

শারদীয়া সন্দেশে তোমার যে 'ভেলকিরাম' সবচেয়ে ভাল লেগেছে, তার কারণ পুণ্যলতা চক্রবর্তীর অন্য অনেক গল্পের মতন এটাও ছোট্ট ছোট্ট গ্রাহকদের জন্যই বিশেষভাবে লেখা।

(২৫) সুদেষ্ণা ও সুস্মিতা বসু (বয়স?)

এতদিনে পরীক্ষা শেষ হয়ে আর জ্বর ছেড়ে দুজনেই নিশ্চিন্ত হয়েছ তো? সম্পাদক মশাইকে তোমরা তাঁর নতুন সম্মানলাভের জন্য অভিনন্দন জানাচ্ছ, জানিয়ে দিলাম তাঁকে।

সমস্ত গ্রাহকদের ও শুভকামনা জানিয়েছে সুদেষ্ণা আর সুস্মিতা।

(২৬) ১৭৮৫, সাধন কুমার দাস ১৫ বছর

আগে সন্দেশে প্রতিমাসে ধাঁধা থাকত, প্রতিযোগিতা খালি বছরে দুবার থাকত। কিন্তু, দেখা গেল যে তাহলে গ্রাহকেরা উত্তর দেবার যথেষ্ট সময় পায় না, তাই একমাস করে ধাঁধা আর একমাস প্রতিযোগিতা থাকবে এই ব্যবস্থা করা হয়েছে।

ছোটদের পত্রিকায় তো সিনেমা বিভাগ থাকেনা, তবে সন্দেশে সম্পাদক মশাই মধ্যে মধ্যে সিনেমা সম্বন্ধে চিত্তাকর্ষক প্রবন্ধ লেখেন।

পত্রবন্ধু চাই—শখ: ডায়রি লেখা, পড়াশুনো করা রবীন্দ্র সঙ্গীত আধুনিক ও অন্যান্য গান শোনা, নাটক শোনা, নাটক, কবিতা, গল্প লেখা সিনেমা দেখা, সন্দেশ পড়া, খোখো খেলা ও পত্রে মিতালি করা।

(২৭) ১৩৫৪ চিত্রলকুমার সান্যাল (বয়স?)

গ্রাহকদের আঁকা আর লেখা এত বেশি সংখ্যক আসে যে সেগুলি দেখতে অনেক সময় লেগে যায়। একই কারণে, কিছু মোটামুটি ভাল লেখা আর ছবি বাদও পড়ে যায়। আরো ছবি পাঠাও। এবার একটা ছবি ছাপা হচ্ছে।

(২৮) ১২৮৪ অমলেশ ভাওয়াল, ১২ বছর

হ্যাঁ ভাই, তোমার ছবি সহ লেখা, খাম, চিঠি, সবই পেয়েছি। লেখাটা ভাল হয়েছে, কিন্তু ছবি এখনও সম্পাদক মশাই দেখবার সময় পাননি। খুব বড় লেখা, ছাপাতে দেরী হয়ে যায় এমনিতেই।

তুমি পরীক্ষায় প্রথম হয়েছ জেনে সুখী হলাম। অভিনন্দন জেনো। ষষ্ঠ থেকে একেবারে অষ্টম শ্রেণীতে উঠেছ, মানে 'ডাব্‌ল্ প্রোমোশন পেয়েছ? খুব মন দিয়ে পড়বে, আরো ভাল করবে।

তোমার জ্যৈষ্ঠের ধাঁধার উত্তর কিন্তু খুঁজে পাইনি—হারাল নাকি? ১৪০ গ্রাহক নম্বর হল অমলেশ (ও রাজেশ) চ্যাটার্জির। ভুল করে 'ভাওয়াল' ছাপা হয়েছিল।

গ্রাহক কার্ড পাঠিয়েছি—পাওনি?

(২৯) ৫১৫ কণিকা ও অর্ণব রায়, ২০৬৬ মিলিন্দ ও নালন্দা চক্রবর্তী

তোমাদের আঁকা কার্ডগুলো সত্যি খুব সুন্দর হয়েছে। বিজয়ার শুভকামনা জেনে আমাদের খুব ভাল লেগেছে।

(৩০) ১৩৬৫ জয়ন্তী রায় চৌধুরী, ১৫ বছর

দেনাবির ঘুড়ি সম্বন্ধে প্রবন্ধ সত্যি খুব ভাল আর নতুন ধরনের।

(৩১) ২১৭০, কুহু মিত্র ১৩½ বছর।

সন্দেশের আরো অনেক গ্রাহক গ্রাহিকাও জানিয়েছে যে লীলা মজুমদারের 'মানসযাত্রা' খুব ভাল লাগছে। ওটা কিন্তু 'উপন্যাস' নয়—ভ্রমণ কাহিনী, ওঁর দাদামশাইর ডায়রি অবলম্বনে লেখা সত্য ঘটনা।

পত্রবন্ধু চাই: শখ—ছবি আঁকা, ডাকটিকিট সংগ্রহ, ভ্রমণ করা ও গল্পের বই পড়া।

(৩২) সমস্ত গ্রাহক গ্রাহিকা—

তোমরা সকলে আমাদের শুভকামনা আর স্নেহাশীর্বাদ জেনো। আরো ভাল করে পড়াশুনা, কাজকর্ম কর। আরো ভালো, লিখো, এঁকো আর সন্দেশকে ভালবেসে সব বিষয়ে সহযোগিতা কর।

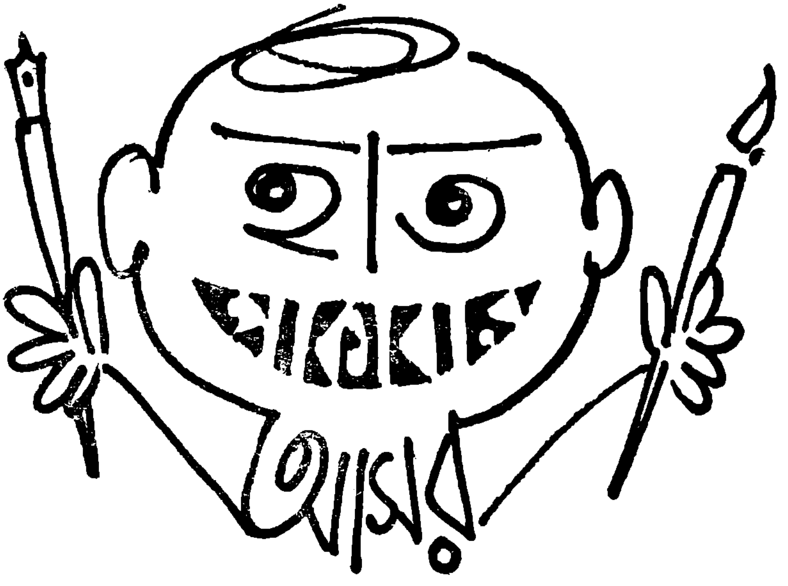

* হাত পাকাবার আসর কেবলমাত্র ১৭ বছরের কম বয়স্ক গ্রাহক-গ্রাহিকাদের জন্য।
* সন্দেশের পছন্দ অনুযায়ী ছড়া, ছবি, গল্প, ধাঁধা ইত্যাদি ছাপানো হয়।
* কাগজের একদিকে পরিষ্কার করে ছাপার জন্য লিখবে।
* ছবি আঁকবার সময় কেবল কালো কালি ব্যবহার করবে।
* সন্দেশের গ্রাহক ক্লাব স্কুল লাইব্রেরির ১৭ বৎসরের কম বয়সের ছাত্র/মেম্বাররাও এই আসরে যোগ দিতে পারবে।
* নাম, বয়স ও গ্রাহক নং স্পষ্ট করে লিখবে।

আমার দেখা একটি ঘটনা

নন্দিতা সরকার, ১০৭/১১ বছর

ঘটনা এরকম অনেক শুনেছি, কিন্তু স্বচক্ষে দেখিনি আজ পর্যন্ত, আমার ছোট মনে বারবার এই ইচ্ছে হচ্ছিল আমি কেন হলাম না এই ঘটনার রক্ষাকর্তা! ঘটনাটা তাহলে খুলেই বলি বন্ধুদের, ছোট একটা মেয়ে সেদিন তার মার বন্ধুদের মজলিসের ফাঁকে খেলার লোভে ধীরে ধীরে তেতলা থেকে দোতলা এবং দোতলা থেকে একতলা চলে এল, মার স্নেহের পাহারা এড়িয়ে। সে একলা বেড়াবার নেশায় মেতে উঠল। ঘরের কাছেই মস্ত বড় দিঘি 'দেবাই পুকুর' নামে খ্যাত, পুকুরের জল তেতলা থেকে সে দেখে আর ভাবে—পুকুরের জল ঢেউয়ের তালে তালে তাকে ডাকছে। একলা চলার আনন্দে সে পায়ে পায়ে এগিয়ে গেল পুকুরের পাড়ে। মিনিট কয়েকের মধ্যে পুরো পাড়া সচকিত ডাক, হাঁক, কান্না, বিলাপে। রক্ষা পেল মেয়েটি যার দৌলতে সেও দশ বৎসরের মেয়ে। বাজারে যাবার পথে সেই প্রথম মেয়েটিকে পড়তে দেখে জলে, ছুটে গিয়ে জড়িয়ে ধরে টেনে আনে পাড়ে ওকে, প্রথম কর্তব্য যা বিপদের সময় করা উচিত সেই কাজটিই কত বুদ্ধির সঙ্গে মেয়েটি করে গেল নীরবে। অন্যরাতো শুধু ভিড় আর গোলমালের সৃষ্টি করল, আমার বাবা বললেন বিপদে এই প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব অনেক বিপদ এড়াবার উপায়।

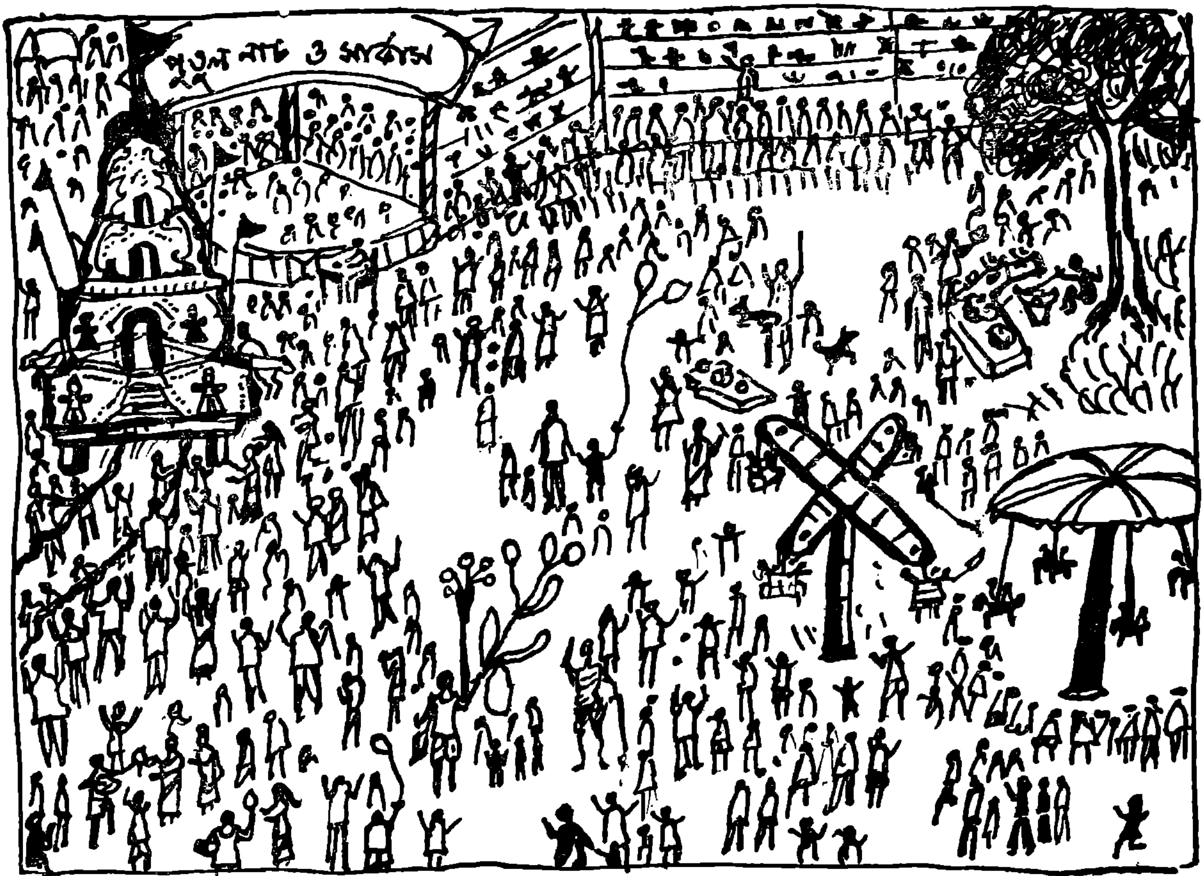

শ্রী. চিত্রল কুমার সান্যাল । অগ্রহায়ণ - ১৩৫৪ । ১৪ বছর

"চাঁদ"

শৌনক পাল ১৩৫৫/৬ বছর

একটা পাথর ভাবে, চুপ করে থাকি,
কি আনন্দে আকাশেতে উড়ে যায় পাখী।
তাই একদিন নিজে মেলে দিল ডানা
আকাশেতে উড়ে গিয়ে হল চাঁদ মামা।

বীর

কৃষ্ণকুন্তল বসু ১৫০৬/৭ বছর

সাবাস্! কি বা বীর।
লোকটা মারল তীর,
বাঘটা গেল মরে,
হই হুল্লোড় ক'রে,

ধাঁধার উত্তর

দেবজিৎ নাগ ১৪২১/১২ বছর

পরীক্ষা।

★ ছবি-দেখে গল্প-লেখা প্রতিযোগিতা ★

(আষাঢ়ের সন্দেশে প্রকাশিত)

ডাকাত ধরা

অভিজিৎ চৌধুরী, ১১২২/১১ বছর

(প্রথম পুরস্কার—ক বিভাগ)

পলাশপুরের জমিদার চন্দ্রমাধববাবু রোজকার মত আজও তোয়ালে পরে বসে তেল মাখছিলেন। তাঁর শখ শুধু তিনটি, শীতে গ্রীষ্মে তৈল মর্দন করা, বাগান করা আর বিখ্যাত হওয়ার চেষ্টা করা। কেউ বাগানের ফুল ছিঁড়লে তিনি রেগে লাল!

'হুজুর, পাগলা রবি আবার ফুল ছিঁড়েছে,' জমিদারবাবুর ব্যাঘাত ঘটাল এক পেয়াদা। ক্রুদ্ধ চন্দ্রমাধববাবু হুংকার দিয়ে উঠলেন—'তোরা কি করছিলি, অ্যাঁ? বারে বারে ওই পাগলা রবি আমার এত কষ্টের ফোটানো ফুল ছিঁড়ে দিয়ে যায় আর তোরা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখিস, না! আজ আমিই ওকে শায়েস্তা করব।' ঐ অবস্থাতেই তীব্র বেগে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন উনি! পেছন পেছন ছুটল পেয়াদা। তার ত 'ন যযৌ ন তস্থৌ অবস্থা, সে ভয়ে ভয়ে দরজাটা একটু ফাঁক করে দেখতে লাগল জমিদারবাবু কি করেন।

চন্দ্রমাধববাবুর কিন্তু হুঁশ নেই, তিনি হনহন করে তীব্র বেগে হেঁটে চলেছেন। আরে ঐ যে গাছটার তলায় মুখ ফিরিয়ে দাড়িয়ে আছে, ওটা পাগলা রবি না? দেখা যাক তো। তিনি ছুটে গিকে লোকটির পিঠে এক প্রচণ্ড চাপড় মেরে চেঁচিয়ে উঠলেন—'বাছাধন, ঘুঘু দেখেছ—ফাঁদ দেখ নি। এবার তোমাকে চাবকিয়ে লাল করে দেব!' লোকটা হাঁউমাউ করে উঠল, 'ওরে বাবা এখানেও টিকটিকি!—তোমাকে অনেক টাকা দেব আমায় ছেড়ে দাও!'

আরে! এতো পাগলা রবি নয়—তবু এর মুখটা চেনা চেনা মনে হচ্ছে……হঠাৎ জমিদার বাবুর মনে পড়ল তিনি লোকটার ছবি সংবাদপত্রে দেখেছেন। এর নাম চাঁহু ডাকাত। যে একে ধরে দিতে পারবে সে পাঁচশো টাকা পুরস্কার পাবে। চন্দ্রমাধববাবু অতি উল্লাসে লোকটাকে হিড়হিড় করে টেনে বাড়ির ফটকের কাছে এসে প্রবল জোরে চিৎকার করে উঠলেন, 'ওরে ডাকাত ধরেছি, ডাকাত!! কে কোথায় আছিস র‍্যা—চলে আয়!'

ওদিকে চাঁহু ডাকাত সর্বশক্তি প্রয়োগ করে পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছে। জমিদারবাবু পরিত্রাহি চিৎকার করছেন কিন্তু পাইক-পেয়াদারা তাঁকে খুঁজতে চারিদিকে বেরিয়ে পড়েছে, তাই কেউ আসছে না। লোকটাকে তিনি প্রায় কাত করে ফেলেছেন—এমন সময় ডাকাত গেঁজ থেকে আচমকা একটা ছুরি বার করল। জমিদারবাবু ভয়ে দু পা পিছিয়ে গেলেন। 'তোকে খুন করে গ্রাম থেকে সরে পড়ব' বলে লোকটা ছোরা শূন্যে তুলল……।

ঠিক এই সময় পাগলা রবি কোথেকে লাঠি হাতে ছুটে এসে দমাস করে ডাকাতের মাথায় মারল এক প্রচণ্ড ঘা। চাঁদু চোখে সর্ষেফুল দেখে অজ্ঞান হয়ে গেল।

তারপর? তারপর আর কি! পুলিশ এসে চাঁদুকে ধরে নিয়ে গেল; জমিদারবাবু পুরস্কার ত পেলেনই, উপরন্তু তাঁর তিন নম্বর ইচ্ছা 'বিখ্যাত হওয়া' ও পূর্ণ হল। কাগজে কাগজে চন্দ্রমাধববাবুর নাম ছড়িয়ে পড়ল। আর পাগলা রবি? সে মহাসুখে জমিদারবাড়িতে থাকে, তারজন্যইত জমিদারবাবু বিখ্যাত হলেন! সে এখন যত ইচ্ছা ফুল ছেঁড়ে।

উচাটন সাধুর গল্প

অভিজিৎ চৌধুরী, গ্রাহক নং ৪৬৯/১৬ বছর—(প্রথম পুরস্কার—খ বিভাগ)

উচাটন সাধুর নাম তোমরা শোননি; সে যে এখন কোথায় কে জানে! আমি তাকে সেই একবারই দেখেছিলুম, পুরীতে। সমুদ্রের ধারে ছোটপিসিদের একখানা বাড়ি খালি পড়েছিল মালীর জিম্মায়। সেখানে গিয়েছিলুম পুজোর ছুটিতে।

সমুদ্রের ধারে পিসিদের বাড়ি। সামনে ধু ধু বালি ঢালু হয়ে নেমে গেছে। এবাড়ির মুখোমুখি একখানা একতলা বাড়ি ছিল। মালীর কাছে শুনলুম সে বাড়ির মালিক থাকেন ভুবনেশ্বরে। বাড়িখানা করেই বিপদে পড়েছেন। কৃপণ মানুষ, মালী রেখে বাজে খরচ করতে চাননি। ফলে খালি বাড়ি একখানা তালা সম্বল করে পড়েছিল। বছর দেড়েক আগে এক সাধুবাবা ওবাড়িতে এসে উঠলেন। মালিকের সম্মতি না নিয়েই। খালি বাড়ি পেয়ে তালা ভেঙে জবরদখল। সারাদিন যাগযজ্ঞ, মারণ-উচাটন নিয়ে থাকেন। উচাটনে তাঁর জুড়ি নেই বলে লোকে তাঁকে ডাকে 'উচাটনসাধু' বলে।

কিন্তু মালিক তাঁকে থাকতে দিতে নারাজ। দেড় বছর ধরে আদালতে মামলা ঝুলিয়ে বসে আছেন সাধুকে তাড়াতে। কিন্তু দেওয়ানী মামলাতো, কবে যে রায় বেরোবে তার ঠিক কি! সুতরাং গত দেড়টি বছর উচাটনসাধু ওবাড়িতে দিব্যি বহাল তবিয়তে আছেন।

একাহিনী শোনার পর উচাটনসাধুকে দেখার জন্যে ভারী কৌতূহল হচ্ছিল। শুনেছি তিনি সূর্যোদয়ের আগে বাড়ি থেকে বেরিয়ে সমুদ্রস্নান করে এসে সেই যে বাড়িতে ঢোকেন, আর বেরোন না। বেলা আটটার আগে আমার ঘুম ভাঙে না। তাই উচাটনসাধুকে দেখা আর আমার হয়ে উঠছিলো না।

কিন্তু একদিন হঠাৎ তাঁকে দেখতে পেলুম। ভোররাতে সেদিন ঘুমটা দৈবক্রমে ফিকে হয়ে এসেছিল। মাথার কাছের জানলাটা সারারাত খোলা থাকে, ঝড়ের মতো হাওয়া আসে। শীতশীত করছিল উঠে জানলাটা বন্ধ করতে গিয়ে যা দেখলুম, তাতে আমি থ।

উচাটনসাধুর বাড়ির দরজা খোলা। একদল পাইক সে বাড়ি থেকে জিনিসপত্র বার করে একটা গাড়িতে তুলছে। গাড়িতে সব কিছু তোলা হলে, একজন পেয়াদাকে দরজায় মোতায়েন রেখে তারা গাড়িতে গিয়ে উঠল।

ঠিক এমনি সময়ে একজন ছুটতে ছুটতে এসে উপস্থিত হলেন। বড় বড় চুল, দাড়িগোঁফ, কোমরে তোয়ালে জড়ানো। নির্ঘাৎ সেই সাধু; চান করতে করতে উঠে এসেছেন। হন্তদন্ত হয়ে তিনি বাড়িতে ঢুকতে গেলেন, পেয়াদা পথ আটকালো। এদিকে গাড়ি ততক্ষণে ছেড়ে দিয়েছে। ক্যারিয়ারে চাপানো মালপত্তর দেখে সাধুর তো চক্ষু চড়ক গাছ। আর বাড়ির দিকে না চেয়ে 'মেরা সামান—মেরা সামান' বলে চেঁচাতে চেঁচাতে সেই তোয়ালেপরা অবস্থাতেই চলন্তগাড়ির পিছু পিছু ছুটে গেলেন।

এই পর্যন্তই দেখেছিলুম। পরে মামার কাছে শুনেছিলুম, ওবাড়ির মালিক আদালতের হুকুম পেয়ে পাইক দিয়ে সাধুকে উচ্ছেদ করে বাড়ির দখল নিচ্ছেন।

কিন্তু এর পর উচাটনসাধুর কি হয়েছিল তা আর জানি না।

পরাগ রায়
৬৫১
৯ বছর

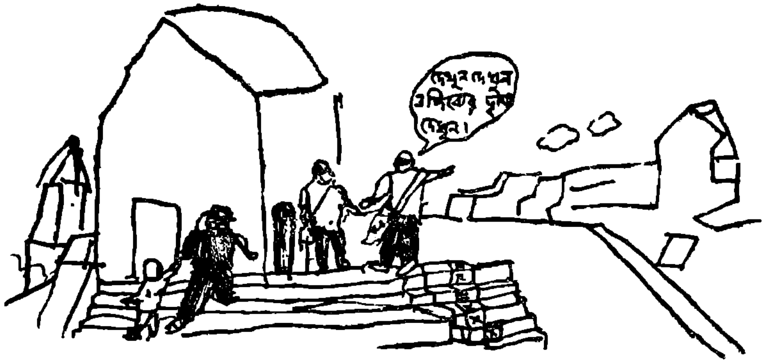

'সোনার কেল্লা'র দৃশ্য।

রত্নাভ বন্দোপাধ্যায়—২১৪২/১০ বছর

বাংলার বাইরে বাঙালী

প্রকৃতি মুখার্জী ৩৪৭/১১ বছর

বাংলার বাইরে বাঙালীর হিন্দী শুনলে হাসতে হাসতে দম আটকে যায়। আজকে তাদেরই কথা বলব। একদিন দিল্লীর বাসস্টাণ্ডে একজন বুড়ো ভদ্রলোক দাঁড়িয়েছিলেন একটু পরে বৃষ্টি আরম্ভ হওয়ায় তিনি নিজের ছাতা খুলে নিলেন। বাসস্টপে আর একটি মেয়ে বৃষ্টিতে ভিজছিল। তখন তিনি মেয়েটিকে বললেন, 'এই লেড়কি তুম কেয়োঁ ভিজতা হো? হামারা ছাতিকে নিচে আযাও।' আসলে তিনি বলতে চেয়েছিলেন যে তুমি ভিজছো কেন? আমার ছাতার নীচে চলে এস। কিন্তু হিন্দীতে ছাতি মানে বুক! একবার আমার দাদুর বন্ধু কলিকাতা থেকে সিমলা বদলি হয়ে এসেছিলেন। সেবারে খুব বরফ পড়েছিল। তিনি কাঁপতে কাঁপতে বললেন, 'হে হেথরাম (চাকরের নাম) মোটা-মোটা সুখা-সুখা লেড়কি লে আও, তম জলায়েগা।' তিনি বলতে চেয়েছিলেন মোটা সুখনো কাঠ (হিন্দীতে লকড়ি) আনতে। বললেন লেড়কি যার হিন্দীতে মানে মেয়ে!! এবার আমরা মামীমার কয়েকটি ঘটনা বলব। তিনি যখন হিন্দীতে কথা বলেন আমরা খুব হাসি। একদিন লখনউএ তাঁর সোনার আংটি চুরি হয়ে যাওয়ায় চাকরকে ডেকে বললেন, 'হামারা সোনে কা অংগিঠী চোরি হো গয়া।' হিন্দীতে আংটি কে অংগুঠী বলে আর অংগিঠী মানে উনুন! চুরি হল সোনার উনুন? তিনি একদিন ভৃত্য রামনাথকে বললেন, 'তুম বরতন মাজকে উল্টি করকে রখ দেনা। হিন্দীতে উল্টি মানে বমি করা! আসলে তিনি বলতে চেয়েছিলেন বাসন কটা মেজে উল্টে রাখতে। তিনি একদিন চাকরকে বললেন, 'আজ হামারা খানা নেহি হোগা। আজ হামারা বরাত হ্যায়।' হিন্দীতে বরযাত্রী কে বলে বরাত। তিনি বলতে চেয়েছিলেন যে তাঁর ব্রত এতএব খাবেন না। আবার অনেকে আছেন যাঁরা উত্তর-প্রদেশে থেকে ঠিক বাংলা বলেন না। একজন ভদ্রলোককে বলতে শুনলাম, 'গেঁদটা পেঁড়ে গিয়ে এঁড়ে গেল।' তিনি বলতে চেয়েছিলেন যে বলটা গাছে গিয়ে আটকে গেছে।

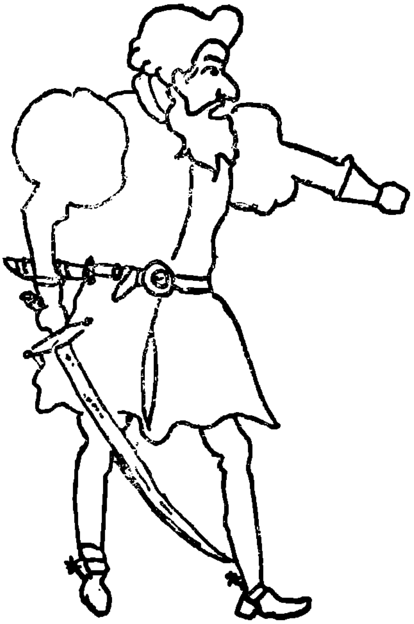

শিবাজী বসু

৫৫২

১০ বছর

শর্মিলা মুখোপাধ্যায়

৯২০

১২ বছর

★

★

শব্দ।

নন্দিনী ভট্টাচার্য

৬৬৪/৮ বছর ৪ মাস

রোজ আমি দেরি করে উঠি, মা ডাকলেও উঠি না, চাদরটা টেনে জড়িয়ে আরাম করে শুই, ভারি মজা লাগে। সেই দিনও রোজকার মতো চাদরটা গায়ে টেনে নিচ্ছি, এমন সময় শুনি টুই টুই টুই টুই, উঠে বারান্দায় গেলাম দেখি এডাল থেকে সেডাল থেকে আবার ও ডাল এই রকম করে টুনটুনিটা ডাকছে, মনে হল আমাকে যেন ও ঠাট্টা করছে। হঠাৎ শুনি কিসে যেন শিস দিচ্ছে উপর দিকে তাকিয়ে দেখি বুলবুলিও এসে গেছেন। হঠাৎ ঘড় ঘড় পোঁক পোঁক মিষ্টি সুরগুলোকে চাপা দিয়ে বিকট আওয়াজ, বিরক্ত হয়ে নিচের দিকে তাকিয়ে দেখি আমাদের নিচে দুধের গাড়ি এসে গেছে। একটু পরেই ঠক্ ঠক্ করে কে যেন দরজা ধাক্কা দিল দেখি গয়লা এসেছে। দাঁত মেজে পড়তে বসেছি এমন সময় আওয়াজ হল ঝন্ ঝন্ ঝনাত্ ছুটে গিয়ে দেখি আমাদের বাড়িতে যে কাজ করে সে একটা সুন্দর প্লেট ভেঙে ফেলেছে, তাই মা বেদম বকছেন।

আবার পড়তে বসলাম অমনি থপাস করে দরজায় কি যেন লাগল দরজা খুলে দেখি কাগজ এসেছে। খানিকটা পড়েছি, অমনি শুনি দুধ কফির বাসন নাড়ার আওয়াজ টুংটাং। সেই সঙ্গে মা ডাকলে, খেতে এস, সবাই মিলে খেতে গেলাম। খেয়ে দেয়ে, পড়া করে, একটা গল্পের বই নিয়ে গিয়ে বসলাম। পড়তে পড়তে অনেকক্ষণ হয়েছে, অমনি শুনি ভঁ ভঁ করে নটার ঘন্টি বেজে গেল। এবার চান করতে যেতে হবে তোয়ালে নিয়ে প থুপ করতে করতে চানের ঘরে চলে গেলাম।

জীবনকৃষ্ণ দাশ

সুবর্ণরেখার শয়তান

শংকুদের বসার ঘরে সন্ধ্যার আসরটা বেশ জমে উঠেছিল। রঙ্গিন সোফা-কোচগুলো দখল করে বসেছিল মিঠু, রূপা, উজান, মনা, তন্ময়, অমর আর শংকুর সুযোগ্য সহকারী মাঃ পিংকু।

মা-মণির দেওয়া ঝাল চানাচুরগুলো বন্ধুদের দিকে মুঠো মুঠো এগিয়ে দিতে দিতে গল্প শুরু করে শংকু, 'তোরা তো জানিস, বড়দিনের ছুটিতে আমি আর পিংকু ছোটনাগপুরে ভোলামামার কাছে বেড়াতে গিয়েছিলাম। রাঁচী শহর থেকে প্রায় মাইল চারেক দূরে—নামকুমে থাকেন ভোলামামা। ভোলামামা ডাক্তার। নামকুমে সুন্দর বাড়ি করেছেন। চারদিকে শাল আর আমলকির ঘন সবুজ বন। একপাশ দিয়ে এঁকে বেঁকে বয়ে গেছে দুর্দম পাহাড়ী নদী সুবর্ণরেখা। দূরে দূরে ছড়িয়ে আছে আদিবাসীদের গ্রাম। ওঁরাও আর মুণ্ডা পল্লী। অনেক রাত পর্যন্ত ওই সব পল্লী থেকে ভেসে আসে মাদলের দ্রিম্ দ্রিম্ শব্দ। সারাটা দিন তো জঙ্গলে জঙ্গলে পাহাড়ে পাহাড়ে হৈ-হৈ করে কাটাই আমি আর পিংকু, রাতে মাদলের সেই বিচিত্র একঘেয়ে দ্রিম্ দ্রিম্ শব্দ শুনতে শুনতে দু'জন ঘুমিয়ে পড়ি। এমনি করেই বড়দিনের ছুটি কাটছিল ছোটনাগপুরের পাহাড় জঙ্গলে।

একদিন খুব ভোরে কাদের চেঁচামেচিতে ঘুম ভেঙ্গে গেল। চোখ রগড়াতে রগড়াতে বাইরে এসে দাঁড়ালাম। একদল আদিবাসী খুব উত্তেজিত হ'য়ে হল্লা করছে। তাঁদের মাঝখানে ভোলামামা বেশ চিন্তিত মুখে দাঁড়িয়ে আছেন। তাদের মধ্য থেকে কালো কুচকুচে জোয়ান ছেলেটি হাত-পা নেড়ে ভোলামামাকে যা বলল, খুব সম্ভব তার বাংলা অর্থ করলে দাঁড়ায়, 'ডাক্তার সাব, এ নিশ্চয়ই কোন শয়তানের কাণ্ড। পর পর এতগুলো ভয়ঙ্কর কাণ্ড ঘটে গেল। এতদিন শয়তানের কথা শুনেই ডাক্তার সাব হেসে উড়িয়ে দিতেন। কিন্তু এবার? এবার আর জীব-জন্তু নয়। শেষ পর্যন্ত একটা গোটা জোয়ান মানুষ নিখোঁজ হ'য়ে গেল! এ শয়তানের কারসাজি ছাড়া আর কি হ'তে পারে?'

লক্ষ্য করলাম ভোলামামার কপালের ভাঁজে ভাঁজে একটা সুস্পষ্ট চিন্তার ছাপ। কোন প্রতিবাদ বা উপহাস করতে পারলেন না ছেলেটার কথায়। কি যেন চিন্তা করে নিয়ে ভোলামামা ওদের চলে যেতে বললেন। ওরা চলে যেতে ভোলামামা ঘরে এসে টেলিফোন করলেন স্থানীয় দারোগা মিঃ আব্রাহাম মুরমুকে। ঘটনার সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিয়ে অকুস্থলে তদন্ত করে দেখার জন্যে অনুরোধ করলেন।

টেলিফোন ছেড়ে দিয়ে টুথপেস্ট ব্রাশ নিয়ে বাথরুমে ঢুকলেন ভোলামামা! আমি কৌতূহলে ফেটে পড়ছিলাম—কিন্তু রাশভারী ভোলামামাকে চট করে জিজ্ঞেস করতেও সাহস পাচ্ছিলাম না।

ততক্ষণে পিংকুরও ঘুম ভেঙে গেছে, আমরাও হাত-

মুখ ধুয়ে ডাইনিং রুমে চললাম ব্রেকফাস্টের জন্যে। ডাইনিং টেবিলে ভোলামামার মুখোমুখি হলাম। মামীমাও সঙ্গে আছে, মনে হ'ল এই তো উপযুক্ত সময়। মাখন মাখানো টোস্টের খানিকটা দাঁতে ছিঁড়ে নিয়ে চিবোতে চিবোতে ফস্ করে জিজ্ঞেস করে বসলাম, 'ভোলামামা, অতগুলো আদিবাসী এসেছিল কেন?'

ভোলামামা চিন্তিত মুখে চা খাচ্ছিলেন, আমার প্রশ্নে ফিরে তাকালেন, একটু ভেবে নিয়ে বললেন, 'কাল রাতে সুবর্ণরেখার চরে একটা লোক নিখোঁজ হ'য়ে গেছে।'

'তাই নাকি?'—আমি আর পিংকু চেঁচিয়ে উঠি, ভোলামামা বললেন, 'এ ধরনের ঘটনা এখানে অবশ্য এই প্রথম নয়। এর আগেও অনেকবার সুবর্ণরেখার চরে গরু, মোষ, ছাগল-ভেড়া অদৃশ্য হ'য়েছে। তবে মানুষ নিখোঁজ হওয়ার ঘটনা এই প্রথম।'

'ব্যাপারটা তা' হলে বেশ রহস্যজনক বল?' বললাম আমি, 'তাতো বটেই!' বললেন ভোলামামা।

'ম্যানইটার-ট্যানইটার নয়তো?' ফস্ করে জিজ্ঞেস করে বসল পিংকু। ভোলামামা হেসে ফেললেন বললেন, 'নাহে, স' মিল বাড়তে বাড়তে ছোটনাগপুরের জঙ্গলের যা হাল হয়েছে—তাতে ম্যান ইটার তো' দূরের কথা, এক আধটা হায়না বা নেকড়ে খুঁজে পাওয়াও দায় আজকাল।

ভোলা মামার কথায় সায় দিয়ে বললাম, 'জানো ভোলামামা, পিংকুটা রিসেণ্টলি জিম্ করবেটের 'ম্যান ইটার অফ্ কুমায়ুন' পড়েছে তো—তাই সব সময় ওর মাথায় ম্যান ইটার ঘুরে বেড়াচ্ছে।'

ভোলা মামা হো হো করে হেসে উঠলেন, 'তাই নাকি? পিংকু বুঝি শিকার কাহিনী পড়তে ভালবাস?'

পিংকু লজ্জা লজ্জা মুখে বলে, 'হ্যাঁ।'

'বেশ, বেশ!' ভোলা মামা উৎসাহ দেন, 'আমার কাছে জন হাণ্টারের 'হাণ্টার' বইখানা আছে। পড়ে দেখ, চমৎকার শিকার কাহিনী। সঙ্গে সঙ্গে আফ্রিকার রহস্যময় জঙ্গলের বিভীষিকার স্বাদ পাবে।'

প্রসঙ্গ অন্যপথে মোড় নিচ্ছে দেখে আমি ফস্ করে বলে ফেলি, 'তা, ভোলামামা এই যে এতসব নিখোঁজ হয়ে যাচ্ছে—আজ অবধি এ রহস্যের কোন কিনারা হল না?' ভোলামামা মাথা নাড়লেন, 'না, তবে এবারে যদি কিছু হয়। এতদিন ওসব গরু-মোষ-ছাগল-ভেড়া নিয়ে পুলিশ তেমন মাথা ঘামায়নি। কিন্তু এবারে অন্য ব্যাপার, জলজ্যান্ত মানুষ, তায় আবার গাঁয়ের সর্দার সারেঙ্গা মুণ্ডার ছেলে।'

হঠাৎ পিংকু দূরের পথের দিকে তাকিয়ে চেঁচিয়ে উঠল, 'ভোলামামা দেখ, দেখ, জীপ ছুটে আসছে।'

আমরা তাকিয়ে দেখলাম, সত্যিই বাতাসে লাল ধুলো উড়িয়ে একটা জীপ এদিকেই আসছে বটে।

ভোলামামা মন্তব্য করবেন, 'পুলিশের জীপ। বোধহয় নামকুম থানার ও. সি মিঃ আব্রাহাম মুরুম এলেন।'

আমরা উঠে পড়লাম। ভোলামামার সঙ্গে গেটের কাছে এসে দাঁড়ালাম। সকালের সোনাঝরা রোদে ছেয়ে আছে প্রান্তরের বুক। ঝিরঝিরে হিমেল হাওয়ায় আমলকির পাতা পড়ছে। যতদূর দৃষ্টি যায় দিগন্তবিস্তৃত হলুদফুলে ভরা সরবুজার ক্ষেত।

পাহাড়ী পথের চড়াই-উৎড়াই ভেঙ্গে জীপখানা ক্রমে আমাদের গেটের কাছে এসে দাঁড়াল। তা থেকে একজন পুলিশ অফিসর এবং দুজন কনস্টেবল নামল। ভোলামামা এগিয়ে গিয়ে অফিসরের সঙ্গে করমর্দন করলেন, 'গুড মর্নিং মিঃ মুরুম।'

'মর্নিং ডঃ চৌধুরী।'

সহাস্যে প্রতি নমস্কার জানালেন মিঃ মুরুম। তারপর আমাদের দিকে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকিয়ে বললেন, 'এ দুটি?'

ভোলামামা আমাদের পরিচয় দিলেন। আব্রাহাম সময় নষ্ট না করে ভোলামামাকে উদ্দেশ্য করে বললেন, 'যদি আপনার সময় হয়, চলুন না একবার স্পটটা দেখে আসা যাক।'

ভোলা মামা বললেন, 'চলুন অসুবিধে আর কি!'

আমাদের যে কি ভীষণ ইচ্ছে হচ্ছিল জীপে চড়ে জায়গাটা গিয়ে দেখে আসার, অথচ মুখ ফুটে ভোলামামাকে বলার মত সাহস পাচ্ছিলাম না। কিন্তু মিঃ আব্রাহাম যেন অন্তর্যামী। আমাদের মুখ দেখেই বোধ হয় মনের খবরটি টের পেয়েছেন। পুলিশ তো! হাসি মুখে আমাদের দিকে তাকিয়ে ইংরেজীতে প্রশ্ন করলেন, 'যাবে?'

আমরা যেন আকাশ হাতে পেলাম। ভোলামামার চোখের ইশারায় অনুমতি পেয়ে একলাফে জীপে চড়ে বসলাম আমি আর পিংকু। সুবর্ণরেখার তীর ধরে জীপ ছুটে চলল।

সুবর্ণরেখা এখন ক্ষাণস্রোতা। এক পাড়ে ঘন শালের জঙ্গলে ঢাকা পাহাড়—অন্যদিকে বিস্তীর্ণ প্রশস্ত বালিয়াড়ী।

একটা কালভার্টের কাছে আমাদের জীপ পৌঁছাতেই চোখে পড়ল ছোটখাট একটা উত্তেজিত জনতা। কালো পাথরের খোদাই করা সজীব কিছু মূর্তি হাত মুখের বিচিত্র ভঙ্গি করে উত্তেজিত ভাবে কথা বলছে।

জীপ থামতেই দলটি জীপের কাছে এগিয়ে এলো। সবাই চেঁচিয়ে এক সঙ্গে ঘটনার বিবরণ দিতে লাগল। মিঃ মুকুন্দ হাত নেড়ে ওদের থামতে বলে একজন একজন করে স্টেটমেণ্ট দিতে বললেন। বলাবাহুল্য ভাষাটা হিন্দি ও মুণ্ডারীর অপভ্রংশ, তবে তার মধ্যে থেকেই দু' কান সতর্ক করে ঘটনার বিবরণ বুঝতে চেষ্টা করলাম। ঘটনার বিবরণ দিচ্ছিল মার্কাসের বন্ধু জগন্নু। স্থানীয় ক্ষুদ্রায়তন শিল্প এ্যানসেলরীতে কাজ করত গ্রাম সর্দার সারেঙ্গা মুণ্ডার ছেলে মার্কাস মুণ্ডা এবং তার বন্ধু জগন্নু ওঁরাও। মাঝে মাঝেই দু' বন্ধুতে ফ্যাকটারীতে ওভার টাইম খাটে। গতকাল রাতেও দু'জনে ওভার টাইম খেটেছে। ফ্যাকটরীর চীপ ক্যান্টিনেই খাওয়া দাওয়া সেরে নেয়। তারপর দুই বন্ধুতে মিলে যখন বাড়ির উদ্দেশ্যে রওনা হয় তখন রাত ন'টা।

ডিসেম্বরের শেষ। প্রচণ্ড শীত পড়েছে—তার সঙ্গে তেমনি ঘন কুয়াশা। দু'হাত দূরের মানুষ চোখে দেখা যায় না। জঙ্গলের মধ্য দিয়ে সংক্ষিপ্ত পথেই বাড়ি ফিরছিল ওরা। এই কালভার্টটার কাছে, এসে দাঁড়িয়ে পড়ে মার্কাস। জগন্নুকে উপরে অপেক্ষা করতে বলে সে নীচে নেমে যায়। মার্কাসের বারমেসে পেটের গণ্ডগোল ছিল। কাজ করতে করতে প্রায়ই ওকে লেট্রিনে ছুটতে হ'ত। সুতরাং নিশ্চিন্ত মনেই কালভার্টটার ওপর দাঁড়িয়ে ছিল জগন্নু। মার্কাস তখন বালির চর ধরে সুবর্ণরেখার যেখানে শীর্ণ স্রোতটুকু আছে—সেদিকেই এগিয়ে যাচ্ছিল। ঘন কুয়াশার আড়ালে ওর ছায়া ছায়া শরীরটা একসময় হারিয়ে গিয়েছিল। আর তার কিছুক্ষণ পরেই নীরব নিথর শীতের রাতকে সচকিত করে মার্কাসের একটা ভীতি-ব্যাকুল আর্তনাদ ভেসে এসেছিল। ঘটনার আকস্মিকতায় জগন্নু হতভম্ব। আশ পাশের গাছগুলো কতগুলো প্রেতের ছায়ার মত তাদের অস্তিত্বকে জাগিয়ে রেখেছে শুধু। একটু বুঝি ভয়ও পেয়েছে জগন্নু। পাবারই কথা। নিঃশব্দ নীরব শীতের রাত্রি। চারিদিক কুয়াশায় মগ্ন। মার্কাস শুধু একটা আর্তনাদ করেই থেমে গেছে। বার তিনেক তার আর্তনাদটা শুধু প্রতিধ্বনিত হয়েছে দূরের পাহাড়ে।

কিছুক্ষণ কিংকর্তব্যবিমূঢ়ের মত দাঁড়িয়ে থেকে গলা ছেড়ে ডাকল জগন্নু 'মার্কাস-স্-স্!'

নিঝুম শীতের রাতকে খান্ খান্ করে দিয়ে দূরের পাহাড়ে ধাক্কা খেয়ে একটা বিদ্রূপাত্মক প্রতিধ্বনি বার বার ফিরে আসতে লাগল, 'মার্কাস-স্-স্' 'মার্কাস-স্-স্' 'মার্কাস-স্-স্।'

সত্যিই এবারে ভয় পেয়েছে জগন্নু। প্রচণ্ড ভয়! ভয়ের তাড়ায় অজ্ঞানের মত নদীর তীর ধরে সোজা ছুটেছে, ছুটেছে আর ছুটেছে। ও নিজেই জানেনা কখন এবং কিভাবে নিজের বাড়িতে ফিরেছে।

জগন্নুর স্টেটমেণ্ট নিয়ে মিঃ মুকুন্দ বাইনোকুলারে চোখ লাগিয়ে আশপাশটা একবার দেখে নিলেন। তার পর জগন্নুর দেখান পথে নীচে নামতে লাগলেন।

আমরাও ওঁর পিছন পিছন চলতে লাগলাম। অনেক নীচে নেমেই তবে সুবর্ণ রেখার বালিয়াড়ী। হঠাৎ মিঃ মুরুমের দৃষ্টি অনুসরণ করে আমরাও দেখতে পেলাম একজোড়া পায়ের ছাপ বালুর উপর পরিষ্কার দাগ কেটে কেটে নদীর যেখানে জল সেদিকেই এগিয়ে গেছে। এক সময় আর পায়ের দাগ দেখা গেল না। অথচ আশ্চর্য এই যে, যেখানে মানুষের পায়ের দাগ শেষ হয়ে গেছে সেখানে আরও কিছু গোল গোল বিচিত্র পায়ের ছাপ লক্ষ্য করলাম। আমি ছবি আঁকি। কাজেই এই সব পায়ের ছাপগুলো দেখে আমার মনে হ'ল গরু-বা মোষের পায়ের ছাপ। মুখে কিছু বলা উচিত নয়—সঙ্গে পুলিশ অফিসর আছেন, তাই চুপ মেরে গেলাম। মিঃ মুরুম্ কিছুক্ষণ গম্ভীর ভাবে সেই চিহ্ন গুলো পরীক্ষা করে দেখে ভোলামামাকে উদ্দেশ্য করে বললেন, 'ডঃ চৌধুরী যা ভেবেছিলাম তাই।'

'কি! কি ভেবেছিলেন?' ভোলামামার কণ্ঠস্বরে অদম্য কৌতূহল উথলে ওঠে।

মিঃ মুরুম্ একটা দীর্ঘশ্বাস্ ছেড়ে বললেন, 'দ্য পুয়োর ইয়ং ম্যান হ্যাজ বিন কিল্ড বাই এ লেপার্ড।' চমকে উঠলাম আমি! লেপার্ড! মানে চিতা? চিতা মেরেছে মার্কাস মুণ্ডাকে! অসম্ভব! ওগুলো কখনই চিতার পায়ের ছাপ হতে পারে না। এগুলো চিতার পায়ের ছাপ হ'লে ছবি আঁকাই ছেড়ে দেব আমি। অথচ মুখ ফুটে প্রতিবাদ করতে পারছিনা। আরও আশ্চর্য হলাম এই দেখে যে ভোলামামা প্রায় মিঃ মুরুমের মতামতকেই মেনে নিয়েছেন। যদিও তিনি একবার বলেছিলেন, 'চিতা! এখানের এই জঙ্গলে?' মিঃ মুরুম যুক্তি দেখিয়েছেন, 'কেন? হোড়হাপ রিজার্ভ ফরে স্টথেকে এক আধটার পক্ষে পালিয়ে আসা কি একেবারেই অসম্ভব ডাঃ চৌধুরী?'

ভোলা মামা এর উত্তরে কিছু বলেন নি। যাই হোক বাড়ি ফিরে এলাম। দুপুরে খেয়ে দেয়ে আমি আর পিংকু শুয়ে পড়লাম। বেলা আড়াইটার সময় ভোলামামা তাঁর নতুন কেনা রাজদূত মোটর সাইকেলে লাল ধুলো উড়িয়ে শহরের চেম্বারে গেলেন। আমি আর পিংকুও সঙ্গে সঙ্গে বিছনা ছেড়ে উঠে পড়লাম। হাত মুখ ধুয়ে সন্দেশ ও কলা খেয়ে মামীমাকে রাজী করিয়ে বেরিয়ে পড়লাম।

এলাম সেই কালভার্টের কাছে। নতুন করে খুঁটিয়ে দেখলাম আবার সব। বালিতে নামলাম। আবার এগিয়ে গেলাম সেই পায়ের চিহ্ন লক্ষ্য করে। পিংকু ভয়ে ভয়ে বলল, 'চল শংকুদা পালিয়ে যাই। গোয়েন্দাগিরি করে দরকার নেই। আবার যদি সেই লেপাডর্টা এসে পড়ে?'

পিংকুকে ধমকে উঠলাম, 'মেলা বকিসনে তো! লেপার্ড না কাঁচকলা।' 'তবে বাফেলো—টাফেলো?'…

'ঘোড়ার ডিম।' আবার ধমকে উঠি পিংকুকে। কিছুই মাথামুণ্ডু ভেবে পাচ্ছিলাম না। তাই ভীষণ বিরক্ত হচ্ছিলাম মনে মনে। হাতে একটা মস্ত সাইজের পাথরের টুকরো ছিল। রেগে-মেগে সেটা ছুঁড়ে মারলাম সুবর্ণরেখার কাছাকাছি স্যাণ্ডবেডে। হঠাৎ একটা অদ্ভুত ব্যাপার লক্ষ্য করে চেঁচিয়ে উঠলাম 'পিংকু! পিংকু!!'

পিংকু ঘাবড়ে গিয়ে আমায় জড়িয়ে ধরল 'কি হল শংকুদা?' আমি অন্যমনস্ক ভাবে জিজ্ঞেস করলাম 'ইউরেকা মানে কি জানিস?'

'হ্যাঁ জানি।'

'কে, কখন এবং কেন ঐ শব্দটা ব্যবহার করেছিল বলত?'

'এ আর এমন কঠিন কি।' পিংকু সগর্বে বলল, 'সিসিলি দ্বীপের বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক আর্কিমিদিস বাথরুমে স্নান করতে গিয়ে হঠাৎ আবিষ্কারের আনন্দে চেঁচিয়ে উঠেছিল, 'ইউরেকা-ইউরেকা' অর্থাৎ 'পেয়েছি-পেয়েছি'। কিন্তু তুমি কি পেয়েছ শংকুদা?'

'বাড়ি চল,' বলেই হিড় হিড় করে পিংকুকে টেনে নিয়ে বাড়ির দিকে এগিয়ে চললাম। উত্তেজনায় আমি কাঁপছিলাম। দারুণভাবে আমার বুকটা ওঠানামা করছিল। তা সত্বেও পিংকু আমাকে ঘাঁটাতে সাহস করেনি। কারণ ও জানে তখন আমাকে কোন প্রশ্ন করলে ও ধমক খাবে। ভোলা মামা রাতে যখন চেম্বার থেকে বাড়ি ফেরেন—তখন আমরা সাধারণত ঘুমিয়ে পড়ি। সেদিনও ভোরের প্রতীক্ষায় ছট ফট্ করতে করতে ঘুমিয়ে পড়লাম।

সকালে চায়ের টেবিলে ভোলামামাকে চমকে দিয়ে বললাম, 'ওসব লেপার্ড ফেপার্ড বাজে কথা' বুঝলে ভোলামামা। মার্কাস মুণ্ডাকে মোটেই লেপার্ডে নিয়ে যায়নি।'

'তবে?' ভোলামামা চায়ে চুমুক দিয়ে প্রায় বিষম খেতে খেতে নিজেকে সামলে নিলেন। আমি বললাম, 'আদিবাসীদের ধারণাই সত্যি!'

'তার মানে, তুই বলতে চাস মার্কাসকে শয়তান নিয়ে গেছে?'

'প্রায় তাই!' আমি দৃঢ় স্বরে বললাম।

'বাজে বোকনা।' ধমকে উঠলেন ভোলামামা, 'প্রমাণ করতে পারবে?'

'নিশ্চয়ই।' আমি অবিচলিত কণ্ঠে বলি, 'আপনি মিঃ মুরুমকে এক্ষুনি টেলিফোনে ডাকুন—আমি সঙ্গে সঙ্গে প্রমাণ করে দেব।'

ভোলামামা অবিশ্বাসের দৃষ্টি নিয়ে মামীমার মুখের দিকে তাকালেন। মামীমা দয়াপরবশ হয়ে বললেন, 'তুমি একটিবার ডাকইনা মিঃ মুরুমকে। অত করে যখন বলছে শংকু। তাছাড়া সেবারে ঘোষাল মশাইদের কেসটার সমাধান আমাদের শংকুইতো করেছিল।' ('ব্যাপারটা যখন মার্ডার' শ্রাবণ ১৩৮০ সন্দেশ)

অবশেষে কিন্তু-কিন্তু মনোভাব নিয়ে মিঃ মুরুমকে টেলিফোন করলেন ভোলামামা।

আধঘণ্টার মধ্যেই জীপ ছুটিয়ে এসে হাজির হলেন মিঃ মুরুম। বেশ খানিকটা বিরক্তির সাথে একটা চাপা কৌতুকের আভাসও লক্ষ্য করলাম মিঃ মুরুমের চোখে মুখে। সকৌতুকে আমার দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করলেন; 'ডিড য়ু ফাইণ্ড দ্য ডেভিল মাঃ শংকু?' আমি গম্ভীর হয়ে দৃঢ়স্বরে জবাব দেই, 'ইয়েস, আই ফাউণ্ড ইট।' মিঃ মুরুম বোধহয় এতখানি দৃঢ়তা আশা করেন নি আমার কণ্ঠে। তাই বেশ জরিপ করা দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে লঘু পরিহাসের সুরে বললেন, 'ও, কে, লেটস্ গো এ্যাণ্ড সী ইট্।'

মিঃ মুরুম সময় নষ্ট না করে জীপে উঠে বসলেন। ভোলামামার সঙ্গে আমরাও উঠে পড়লাম। জীপটা সেই পরিচিত কালভার্টটার কাছে এসে দাঁড়াল। আমরা নেমে চললাম সুবর্ণরেখার বালির চরের দিকে। সেই পুরনো পদচিহ্ন লক্ষ্য করে। পিংকু উস্‌খুস্ করছে আর বার বার আমার মুখের দিকে জিজ্ঞাসু দৃষ্টি নিয়ে তাকাচ্ছে। চলতে চলতে আমি নীচু হয়ে প্রায় এক

কিলো ওজনের একটা গোল মত পাথর তুলে নিলাম হাতে। সেদিকে তাকিয়ে মিঃ মুরুম ঠাট্টা করে বললেন, 'পাথর দিয়ে কি করবে মাঃ শংকু?'

আমি হাসিমুখে জবাব দেই, 'এই পাথর দিয়ে আমি শয়তানকে মারব।'

মিঃ মুরুম হো হো করে গলা ছেড়ে হেসে উঠলেন। ভোলামামা ভীষণ রকম বিরক্ত আর গম্ভীর হয়ে আছেন। হয়ত শেষ পর্যন্ত আমাদের ছেলেমানুষীতে মিঃ মুরুমের কাছে অপদস্থ হওয়ার আশঙ্কাতেই।

নির্দিষ্ট জায়গায় পৌঁছে মিঃ মুরুমকে লক্ষ্য করে বললাম, 'দেখুন মিঃ অফিসর, ওইখানে শয়তান ওৎ পেতে আছে।' বলেই হাতের পাথরটা ছুঁড়ে মারলাম সুবর্ণরেখার জলের কাছাকাছি বালিয়াড়ীতে। পাথরটা সবার চোখের সামনে আস্তে আস্তে তলিয়ে যেতে লাগল বালুর মধ্যে। মিঃ মুরুম সকলকে সচকিত করে বিস্ময়-বিস্ফারিত কণ্ঠে চেঁচিয়ে উঠলেন, 'স্ট্রেঞ্জ, স্ট্রেঞ্জ! কুইক্‌স্যাণ্ড।'

ভোলামামাও চেঁচিয়ে উঠলেন, 'কুইক্ স্যাণ্ড! চোরা বালি!'

আমি দ্রুত জবাব দেই মিঃ মুরুমকে উদ্দেশ্য করে, 'ইয়েস অফিসর। ওই চোরাবালিই হোল সুবর্ণরেখার শয়তান।'

মিঃ মুরুম আবেগকম্পিত দু'হাত বাড়িয়ে আমায় জড়িয়ে ধরে বললেন, 'কংগ্রাচুলেশান্‌স, মাই বয়। ইউ আর রিয়্যালী এ ওয়াণ্ডারফুল লিটল ডিটেকটিভ।'

পাশ ফিরে চেয়ে দেখি ভোলামামা বাঁ হাতে পিংকুর গলা জড়িয়ে ধরে মুস্কি মুস্কি হাসছেন। ডান হাতে রাংতায় মোড়া দু খানা ক্যাডবেরী চকোলেট।

চটজলদী গপ্পো

অনির্বাণ রায়

বিশুবাবু মাছ ধরতে বড়ো ভালোবাসেন। একদিন সতেরো থেকে তেরো বিয়োগ করে চার তৈরি করলেন। সেই চার পুকুরে ফেলে মাছ ধরলেন। মস্ত মাছ। মাছ কাটার বঁটি এলো ফরমোজা থেকে। আর ফিজি থেকে এলো বিজ্ঞি কাটুনি। বারো ঘণ্টা লাগলো পাক্কা মাছ কাটতে।

রান্না হলো জোর। বিশুবাবু কাঁকুরে চালের ভাতে মাছের ঝোল মাখলেন। মাছের কাঁটা বেছে এক একটা গ্রাস মুখে তোলেন আর একটা করে কাক এসে জোটে। এমনি করে তিয়াত্তরটা কাক জুটলো। বিশুবাবু তাদের বললেন, 'হু উ-স্, যা'। অমনি কাক ছুটলো মাঠঘাট আঁধার দাদার পেরিয়ে হিমালয়ের পাদদেশে। বিশুবাবুও ক্যামেরা ঘাড়ে করে ছুটলেন তাদের পিছু পিছু। তারপর কোথায় হারিয়ে গেলেন খবর পাওয়া যায় না। কেবল একটা দাঁড়কাক বিশুবাবুর ছবির ওপর চুপচাপ বসে থাকে আর মাঝে মাঝে ডাকে, 'ক্বঃ, ক্বঃ'। বিখ্যাত পক্ষী বিশারদ পাখি সেন তাকে দেখে বলেছেন, 'আশ্চর্য, দাঁড়কাকটার মুখটা ঠিক বিশুবাবুর মতো'। শুনে বেশ পুলকিত হয়েছি। ভাবছি একবার দেখতে গেলে বেশ হয়। যতোই হোক বিশুবাবু ছিলেন আমার বন্ধু। না গেলে খারাপ দেখায়! কী বলো তোমরা, তাইনা?

কোন্ সুদূরের সপ্তসিন্ধু

মলয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

কোন্ সুদূরের সপ্তসিন্ধু,
জানিস মা, আমাকে
মাঝে মাঝেই কোন্ খেয়ালে
হাতছানিতে ডাকে !
তেপান্তরের মাঠ পেরিয়ে
ঘোড়ায় ছুটে চলা
পড়বে পথে অচিন শহর,
ঝর্না, মরু, জলা
চলবে কভু মাথার 'পরে
সোনা-রোদের খেলা
ধ্রুবতারায় পথ দেখাবে
কালো রাতের বেলা।
অনেক অনেক পথ পেরিয়ে
তেপ্সে নদীর পারে
সাত সাগরের দেখা পাবো
প্রবালদ্বীপের ধারে।
অথই জলে হীরের কুচি
দেখব চেয়ে চেয়ে
পড়বে মনে—এরি তলায়
আছে রাজার মেয়ে।

হাজার হাজার রাক্ষসেরা
পাহারা দেয় তাকে
অশ্রুমুখী সেই কন্যে
মনমরা চুপ থাকে।
সাগরশোভা ভুলে তখন
ঝাঁপ দেব সে জলে
মস্ত প্রাসাদ দেখতে পাব
গিয়ে অতল তলে।
সেখানে এক ভোমরা আছে
ফটিক-থামের 'পর
রাক্ষসদের আয়ুটি রয়
তাহারই ভিতর।
দু'হাতে সেই রক্তবীজে
মারতে হবে পিষে
তবে হবে সকল আপদ
বিদায় এক নিমেষে।
তারপরেতে রাজকন্যে
আসব নিয়ে চলে
ঘোড়ায় চেপে টগ্‌বগিয়ে,
মাগো, তোমার কোলে॥

এই এই

চুনীন্দ্রদাশ

এই শাদা এই নীল
শাদা নীল শাদা নীল
এই রোদ এই মেঘ
রোদ মেঘ ঝিলমিল।

এই দেখি ঘর দোর
পাহাড়ের চুড়ো সব
এই দেখি কিছু নেই
শুধু শুনি কলরব॥

ছেলেটা

সোমেশ্বর ভৌমিক

১৯২১ সালের কথা।

মন মেজাজ খারাপ চার্লি চ্যাপলিনের! ছবি করবেন, অথচ ছবির জন্যে গল্প খুঁজে পাচ্ছেন না। এটা ভাবছেন, সেটা চিন্তা করছেন—কখনও একটু লিখেও ফেলছেন হয়ত, কিন্তু মনের মত হচ্ছে না কিছুই। সে এক বিশ্রী ব্যাপার।

মনকে চাঙ্গা করতে অগত্যা গেলেন নাচের আসরে।

হঠাৎ…! কিসের সন্ধান পেয়ে যেন সচকিত হ'য়ে উঠলেন চ্যাপলিন—নড়ে চড়ে সোজা হ'য়ে বসলেন।—একরত্তি এক ছেলে, বছর চার পাঁচ বয়স হবে, সেই মাতিয়ে দিল সারা আসর।

সেদিনকার আসরের মূল নাচিয়ে ছিলেন কিন্তু ছেলেটির বাবা। বাবার নাচ শেষ হ'লে পর ছেলে এসে দাঁড়াল মঞ্চে; তারপর শুরু করল বিচিত্র সব অঙ্গভঙ্গী। অন্য যে কোনো ছেলে যদি এসব করত তাহলে নিতান্ত দৃষ্টিকটু হ'য়ে উঠত ব্যাপারটা। কিন্তু এই ছেলেটার এমন বিশেষত্ব ছিল যার ফলে পুরো জিনিসটাকে সে এক মজাদার দৃশ্যের পর্যায়ে তুলে নিয়ে গেল। ওর কাণ্ডকারখানা দেখে হেসে গড়িয়ে পড়ল হলসুদ্ধ লোক।

ছোট ছেলেটিকে—নাম তার জ্যাকি কুগান, মনে ধরল চ্যাপলিনের। অদ্ভুত এক অনুভূতি নিয়ে সেদিন বাড়ি ফিরলেন তিনি।

পরদিন স্টুডিয়োতে গিয়েছেন, কে যেন খবর দিল অন্য এক চিত্র পরিচালক জ্যাকিকে নিয়ে ছবি করতে চলেছেন। চমকে উঠলেন চ্যাপলিন, এ ব্যাপারটা ত তাঁর মাথায় আসেনি! হঠাৎ কেমন ক্ষেপে উঠলেন তিনি—ওই ছেলেকে তাঁর চাই-ই। উত্তেজনার মাথায় গল্পের প্লটও মাথায় এসে গেল। সারাদিন সারারাত সেটা নিয়ে চিন্তা করলেন চ্যাপলিন…

পরের দিন স্টুডিয়োতে এসেই সহকারীদের নির্দেশ দিলেন প্রস্তুত হ'তে—নতুন ছবির মহড়া হবে। সব্বাই ত অবাক!

দুপুরবেলায় চ্যাপলিন খবর পেলেন সেই পরিচালক ভদ্রলোক জ্যাকিকে নয়, তার বাবা জ্যাক্ কুগানকে নিযুক্ত করেছেন। আকাশের চাঁদ যেন হাতে পেলেন চ্যাপলিন। ফোনে তক্ষুণি জ্যাকির বাবাকে তলব জানান হ'ল—জরুরী প্রয়োজন, অত্যন্ত গোপনীয়!

হন্তদন্ত হয়ে জ্যাক্ কুগান হাজির হলেন চ্যাপলিনের স্টুডিয়োয়, তাঁকে একরকম প্রায় বগলদাবা করেই চ্যাপলিন নিয়ে এলেন নিজের ঘরে। তারপর এক নিশ্বাসে অনেকগুলো কথা বলে ফেললেন উনি, যার সারমর্ম হল এই, জ্যাকিকে নিয়ে একটা ছবি করতে চান চ্যাপলিন, ওর মধ্যে প্রচুর সম্ভাবনা দেখতে পেয়েছেন উনি।

চ্যাপলিনের উত্তেজনায় জ্যাক্ কুগান হতভম্ব হয়ে পড়েছিলেন। কিন্তু চ্যাপলিনের যেন আবার তর সইছিল না। অবশেষে জ্যাক্ কুগান মত দিলেন। চ্যাপলিন ত আনন্দে আত্মহারা। মহা উৎসাহে কাজে লেগে পড়লেন তিনি।

…দীর্ঘ পোনেরো মাস লাগল ছবিটাকে তৈরি করতে। অবশেষে একদিন বাজারে এল চ্যাপলিনের নতুন ছবি THE KID, অর্থাৎ ছেলেটা।

কিন্তু চ্যাপলিনের ছবিতে এবার নতুন সুর। শুধু আর দম ফাটা হাসির দমক নয়—জীবনের পথ যে চোখের জলেও মাঝে মাঝে পিচ্ছিল হ'য়ে ওঠে, সে কথাও চ্যাপলিন মনে করিয়ে দিলেন দর্শকদের…'a film with a smile and perhaps a tear'। কান্নাহাসির দোলায় দুলতে দুলতে দর্শকরা অবাক হ'য়ে দেখলেন পরিত্যক্ত এক শিশু আর বিত্তহীন ভবঘুরের কাণ্ডকারখানা।

নানা গোলমালের মধ্য দিয়ে নামগোত্রহীন এক নবজাত শিশু এসে পড়ে ভবঘুরে চার্লির জিম্মায়। কিছুতেই বাচ্চাটিকে কারো হাতে গছাতে পারে না চার্লি। এমন সময় তার চোখে পড়ল শিশুটির জামায় আটকানো এক চিরকুট; দুঃখিনী মায়ের আবেদন, সহৃদয় কোন ব্যক্তি যেন বাচ্চার ভার নেন।

ভবঘুরে হ'লে কি হয়, দয়ামায়া আছে চার্লিরও মনে। বাচ্চাকে নিজের ডেরায় নিয়ে আসে চার্লি, পরম স্নেহভরে তাকে পালন ক'রতে থাকে সে।

ছেলেটা একটু বড় হ'তেই তার হাত ধ'রে বেরিয়ে পড়ে চার্লি;—পেটের জ্বালা ত' মেটাতে হবে। অদ্ভুত ফন্দি বার করে সে। জ্যাকির, মানে বাচ্চাটার, কাজ হবে রাস্তা থেকে ঢিল ছুঁড়ে বড় বড় বাড়ির জানালার শার্সি ভেঙে দেওয়া। কিছু পরেই চার্লি গিয়ে হাজির হবে অকুস্থলে, শার্সি সারাইয়ের বেশে। খাসা জীবিকা! পুলিসের চোখে ধুলো দিয়ে ওরা চালিয়ে গেল এ ব্যবসা।

ও'দিকে এই ক'বছরে জ্যাকির মা-র জীবনে এসেছে মস্ত পরিবর্তন। নাম করা গাইয়ে হিসেবে প্রচুর অর্থ, খ্যাতি-প্রতিপত্তির অধিকারিণী সে। কিন্তু ভুলতে পারে না সন্তান হারানোর শোক। তাই ঘুরে ঘুরে বেড়ায় বস্তির ছেলেমেয়েদের মধ্যে, তাদের কিনে দেয় খেলনা খাবার।

এর মধ্যে একদিন মা-ছেলের দেখা হয়ে যায় বস্তির মাঝে। আসলে সেদিন জ্যাকি অন্য এক ছেলের সঙ্গে মারামারি করে জখম হ'য়েছিল। গায়িকা তখন সেখানে এসে পড়ে। তারই চেষ্টায় ও সাহায্যে জ্যাকির চিকিৎসা, ওষুধপত্র ইত্যাদির ব্যবস্থা হয়। কিন্তু মা-ছেলে চিনতে পারে না কেউ কাউকে।

গোল বাধাল, কিন্তু ডাক্তার। চিকিৎসা ক'রতে এসে বুঝে ফেলল জ্যাকি চার্লির ছেলে নয়। ব্যাস্, অমনি সে দিল পুলিসে খবর। পুলিসও অনাথ-আশ্রমের লোকজন নিয়ে বস্তিতে হাজির।

জোর ক'রে জ্যাকিকে চার্লির কাছ থেকে ছাড়িয়ে নিয়ে ওরা রওনা দিল। কিন্তু ছাড়বার পাত্র চার্লিও নয়। কৌশলে আবার জ্যাকিকে উদ্ধার ক'রল সে; তারপর সে-তল্লাট থেকেই উধাও হল।

এরপর এক সরাইয়ে। সেখানে ত' বহু কসরৎ করে জায়গা মিলল। কিন্তু আবার ফ্যাসাদ্! —ডাক্তারের কাছে জানতে পেরে গায়িকা (মানে জ্যাকির মা) কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়েছিল তার হারানিধির জন্যে। সরাইওয়ালার চোখে পড়ল সে বিজ্ঞাপন আর তার সঙ্গে জ্যাকির ছবি। ছবির সাথে ঘুমন্ত জ্যাকির চেহারা মিলিয়ে নিয়ে, পুরস্কারের আশায় সে জ্যাকিকে তুলে নিয়ে গেল থানায়।··· গায়িকা খুঁজে পেল তার হারান ছেলেকে।

কিন্তু চার্লি? জ্যাকিকে হারিয়ে তার অবস্থা পাগলের মত। রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে জ্যাকিকে বহু খুঁজল সে, পেল না কোথাও। হতাশ হয়ে চার্লি ফিরে এল তার বস্তির ডেরায়। দোরগোড়ায় বসে ভাবতে ভাবতেই ঘুমিয়ে প'ড়ল সে, আর পৌঁছে গেল স্বপ্নের দেশে।

সুখ স্বপ্ন কিন্তু বেশিক্ষণ স্থায়ী হ'ল না। পুলিস এসে ওকে নিয়ে গেল এক অচেনা বাড়ির সামনে। দরজা খুলে যারা বেরিয়ে এল তাদের দেখে চার্লি অবাক—হারানো মায়ের কোলে তার জ্যাকি!

সংক্ষেপে এই হ'ল The Kid-এর গল্প।

ছবিতে চ্যাপলিনের পাশে দাঁড়িয়েও অনবদ্য অভিনয়ে সবার মন কেড়ে নিল ছোট্ট জ্যাকি কুগান। সত্যি, বিস্ময়কর অভিনয়-ক্ষমতার পরিচয় দিয়েছিল জ্যাকি। অনায়াসে চরিত্রের সমস্ত খুঁটিনাটি নিজের অভিনয়ের মাধ্যমে ফুটিয়ে তুলল সে—অত্যন্ত দক্ষতার সাথে। অবশ্য তার সঙ্গে ছিল চ্যাপলিনের আশ্চর্য শিক্ষা।—ছেলে চিনতে ভুল হয় নি চ্যাপলিনের। বিশ্বের শ্রেষ্ঠ শিশু অভিনেতার সম্মান পেল জ্যাকি কুগান।

আত্মজীবনীতে চ্যাপলিন জ্যাকির উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছেন। কথাপ্রসঙ্গে জ্যাকির অভিনয় প্রতিভা সম্বন্ধে এক মজার ঘটনার উল্লেখ ক'রেছেন তিনি।

ছবির যে-দৃশ্যে অনাথ আশ্রমের লোকেরা জ্যাকিকে জোর ক'রে নিয়ে যাচ্ছে, সেই দৃশ্যের শুটিং-এর সময় চ্যাপলিন চাইছিলেন জ্যাকি সত্যি ক'রে কাঁদুক। কিন্তু সেদিন চ্যাপলিনের শত চেষ্টা সত্ত্বেও কুগানকে কাঁদান গেল না; বরং অন্যান্য দিনের চেয়ে সেদিন সে যেন আরো মুখর ও তৎপর হ'য়ে উঠেছিল।

চ্যাপলিনের অবস্থা দেখে বাবা জ্যাক্ কুগান এগিয়ে এলেন, 'আমি ওকে কাঁদিয়ে দিচ্ছি।'

ইচ্ছে ছিল না চ্যাপলিনের, তবু নিমরাজী হ'লেন। কিন্তু ভেতরে ভেতরে এত মুষড়ে পড়েছিলেন তিনি যে জ্যাকিকে তার বাবার হাতে ছেড়ে দিয়ে চ'লে গেলেন অন্য ঘরে।

কিন্তু বেশিক্ষণ বসা হ'ল না—তারস্বরে জ্যাকির কান্নার শব্দ কানে এল; দৌড়ে গেলেন চ্যাপলিন। অঝোরে কাঁদছে জ্যাকি! ঠিক এইরকমটিই চাইছিলেন তিনি—শুটিং শুরু হ'য়ে গেল।

শুটিং শেষে জ্যাক্‌কে শুধোলেন চ্যাপলিন, 'কি ভাবে কাঁদালেন ওকে?'

—'আমি শুধু ব'ললাম, তুমি যদি কথা না শোনো, তবে সত্যি সত্যিই তোমায় অনাথ আশ্রমে পাঠিয়ে দেওয়া হবে।'

হেসে চ্যাপলিন কোলে তুলে নিলেন জ্যাকিকে। তখনও ফোঁপাচ্ছে বেচারা। সান্ত্বনা দিতে দিতে চ্যাপলিন ব'ললেন, 'না, না, কেউ তোমায় কিচ্ছু ক'রবে না।'

এরপর যা ঘটল তার জন্যে প্রস্তুত ছিলেন না কেউ ই। মুহূর্তের মধ্যে চোখে জল নিয়েই হেসে উঠল ছোট্ট জ্যাকি; তারপর চ্যাপলিনের কানে কানে ব'লল, 'আমি জানতাম, বাবা শুধু ভয় দেখাচ্ছিল।'

অবাক হ'য়ে জ্যাকির মুখের দিকে তাকালেন চ্যাপলিন। জ্যাকি হাসছে তখনও—দুষ্টুমির হাসি; অথচ চোখে জল! কিন্তু সে মুখ দেখে যে-কেউ বিশ্বাস ক'রবে একটুও বাড়িয়ে বা মিথ্যে বলেনি জ্যাকি, সবটাই খেলা তার কাছে !!

কৃতজ্ঞতা স্বীকার—My Autobiography—Charlie Chaplin
চার্লি চ্যাপলিন—মৃণাল সেন

ছড়া

অভিজিৎ বাগচী

সাত বেবুনে রিক্শা চড়ে
দিচ্ছে পাড়ি আমতা
তাই না দেখে ভড়কে গিয়ে
ভোঁদড় ব'লে নামতা
ঘুমের মাঝে নামতা শুনে
চম্‌কে উঠে বাঘ
সাবান জলে তুলল ফেলে
সারা গায়ের দাগ।
দাগমেলানো বাঘকে ধরে
মাথার উপর তুলে
দশটা বোকা পাঁঠা তাকে
চড়িয়ে দিল শূলে।

॥ দুঃখ শুধু ॥

কালিদাস ভট্টাচার্য

লিখতে পারি, পড়তে পারি
খেলতে পারি খেলা,
ধিতাং ধিতাং নাচ্‌তে পারি
সকাল সন্ধ্যাবেলা।
দাদুর সাথে হাঁটতে পারি
অনেকখানি পথ,
রথের দিনে রথের মেলায়
টানতে পারি রথ।
অনেক কিছুই করতে পারি,
দুঃখ শুধু এই
দাদুর মত লম্বা দাড়ি
আমার যে ভাই নেই॥

বিশ্বরূপ

জীবন সর্দার

সুরঙ্গটার নাম 'জওহর'। দক্ষিণের দরজা দিয়ে ঢুকে ওটার ভেতর দিয়ে সোজা উত্তরের দরজা দিয়ে বেরোলাম। তারপর, পথ বাঁদিকে বাঁক নিতেই দেখি অবাক কাণ্ড! বহু নীচে যতদূর চোখ যায়, পাকা ধানের ক্ষেত। সোনালী সবুজ এক সমতলদেশের মাঝ বরাবর আঁকাবাঁকা নদীর রেখা। ধাপে ধাপে পথ সমতলে নেবে এলো। আমার মনে হলো নতুন দেশে এলাম।

নদীটার নাম ঝিলম। সোনালীসবুজ দেশটা কাশ্মীর। জওহর সুরঙ্গটা যে পাহাড় ফুঁড়ে তৈরী তার নাম পীর্ পাঞ্জাল। এ সব কিছুই ভারতবর্ষে, তবু মনে হয় কত অজানা। কেন? এদেশের গাছপালা, মাটি, পাহাড়, হাওয়া মনে হলো নতুন। হিমালয়ে যত উঁচুতে উঠেছি, হাওয়া বদলে গেছে। লোকজন গাছ-পালা পশুপাখি দেখে নতুন মনে হয়েছে। কেন? এ কি শুধু পাহাড়ের উঁচুতে বলে, না অন্য কোন কারণে!

প্রকৃতি-পড়ুয়া হবার জন্য আমি একটি বইয়ের কিছুটা পড়েছিলাম। বইটির নাম—'**দি জিওগ্রাফিকাল্ ডিসট্রিবিউশন অব এ্যানিম্যালস্**'। লেখকের নাম—'**আলফ্রেড রাসেল ওয়ালেস**'। ইনি ছিলেন ইংরেজ প্রকৃতিতত্ত্ববিদ। জন্ম আঠারশ তেইশ সালে। মৃত্যু উনিশশ' তের সালে। ডারউইনের মত ইনিও প্রাণীদের বিবর্তনের সূত্র খুঁজে বের করেছিলেন। তাঁর গবেষণার ক্ষেত্র ছিল ব্রেজিল আর সুমাত্রা জাভা বোর্নিও দ্বীপগুলি। পৃথিবীর বিভিন্ন জায়গায় প্রাণীদের রকমফের দেখে, তার কারণ আর সীমানা ঠিক করে দেন ওয়ালেস। বিজ্ঞানীরা যাকে বলেন 'ওয়ালেসের সীমারেখা'।

হিমালয়ের পীর পাঞ্জাল পর্বত শ্রেণী পার হয়ে আসা মানে, আমি জানতুম, 'ওয়ালেসের একটি রেখা' পার হয়ে আসা। ওয়ালেসের মত অনুযায়ী আমি **অ্যরিএন্টল** বা প্রাচ্য এলাকা থেকে চলে এলাম **ইউরেশিয়ান** বা **প্যালিআর্কটিক** এলাকায়। দুটি

এলাকার আলাদা বৈশিষ্ট্য কি? একটি প্রাণী বৈশিষ্ট্য। প্রাচ্য এলাকায় ছোট কানের হাতি, উল্লুক আর ওরাং-ওটাং, ময়ূর আর হলুদ গায়ে ডোরাদার বাঘ। ইউরেশিয়ান এলাকায় এসব একটাও নেই। উসুরীর ডোরাদার বাঘ আর কেঁদো বাঘের রং একটু আলাদা। প্যালি আর্কটিক এলাকার বল্গা হরিণ, বুনো ছাগল আরগালি আর বুনো গাধা 'কুলান' প্রাচ্য এলাকায় পাওয়া যায় না। প্রাচ্য এলাকায় থর মরুর বা কচ্ছ রণের বুনো গাধার সাথে ঢের গরমিল গোবি মরুর বুনো গাধার। গোনাগুণতি হিসেবে তো বটেই। যেখানে যেটার সংখ্যা প্রচুর সেই এলাকার সেটাই বৈশিষ্ট্য—ওয়ালেস এই নিয়মেই প্রাণীদের ভৌগোলিক অবস্থান নির্দিষ্ট করেছেন। তাঁর নির্দিষ্ট ছটি বিভাগের সামান্য হেরফের হয়েছে। কিন্তু মূল কাঠামোটি ঠিকই রয়েছে।

ওয়ালেসের দৃষ্টিতে পৃথিবীর স্থলভাগের ছ'টি অংশ। প্রত্যেকটি অংশ হয় সমুদ্র নয় উঁচু পাহাড় দিয়ে, একটি আর একটি থেকে বিচ্ছিন্ন। আর সে কারণেই প্রতিটি এলাকায় বিশেষ ধরণের প্রাণীর দেখা মিলবে, যা অন্য এলাকায় নেই (অবশ্য যদি না বাইরে থেকে সঙ্গে নিয়ে আসে কেউ।) প্রাচ্য এলাকার সাথে, ইউরোপ+এশিয়া=ইউরেশিয়ার তুলনা আগেই করেছি। আর বাকি চারটি অংশ: (তিন)—**ইথিওপিয়ান**

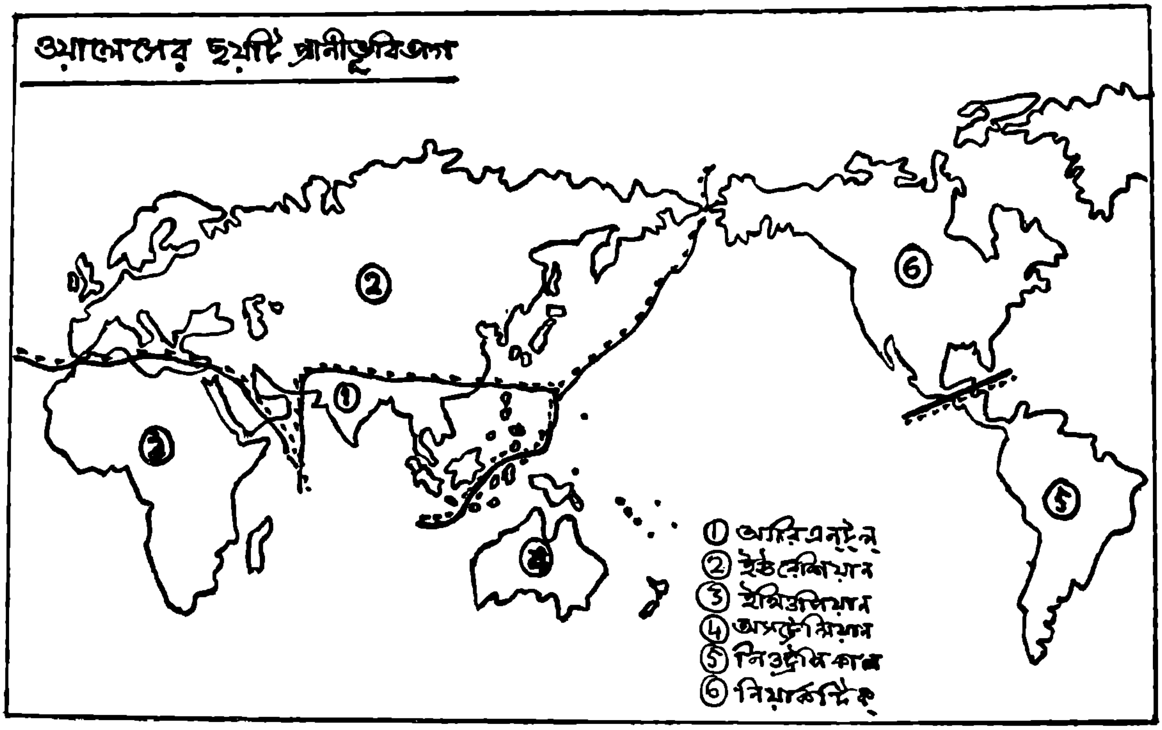

এলাকা বা আফ্রিকা। আফ্রিকার উত্তরের ভূমধ্যসাগরের কিনারায় দেশগুলিকে ইউরেশিয়ার অংশ বলে ধরা হয়েছে। আফ্রিকার বাকি অংশের প্রাণীকুলের বিশেষ পরিচয় আমাদের জানা—বড় কানওয়ালা হাতি, জিরাফ, জেব্রা, গরিলা, জলহস্তী, সিংহ। ভারতের সিংহের সাথে আফ্রিকার সিংহের বেশ গরমিল। (চার)—**অস্ট্রেলিয়ান বা অস্ট্রেলেশিয়ান এলাকা**। এই এলাকাটির সাথে প্রাচ্য এলাকার সীমানা ঠিক করতে ওয়ালেসকে বেশ বেগ পেতে হয়েছিল। মালয় দ্বীপপুঞ্জের প্রতিটি দ্বীপের প্রাণী ও উদ্ভিদের বৈশিষ্টগুলি লক্ষ্য করে, তবে তিনি প্রাচ্য এলাকা থেকে অস্ট্রেলিয়ার এলাকার সীমানা ঠিক বের করেছিলেন। সাধারণভাবে দেখলে দ্বীপগুলির একটি থেকে অন্যটির পার্থক্য কিছুই দেখা যাবে না। কিন্তু কয়েক কোটি বছর আগে, কোন প্রাকৃতিক দুর্যোগে দ্বীপগুলি বিচ্ছিন্ন হয়ে, আলাদা বৈশিষ্ট্য নিয়ে জেগে রয়েছে সমুদ্রের বুকে। কাছাকাছি দুটি দ্বীপ বালি আর লম্বক, দূরত্ব পনের মাইল। ওয়ালেসের মতে বালি পড়ে প্রাচ্য এলাকায় লম্বক 'অস্ট্রেলিয়ান' এলাকায়। এখনকার বিজ্ঞানীদের মতে দুটি এলাকায় প্রাণীই কম বেশী করে মিলেমিশে রয়েছে দ্বীপগুলিতে আনুপাতিক হারে, দ্বীপ থেকে দ্বীপে পূব থেকে পশ্চিমে এগোলে, প্রাচ্য এলাকার প্রাণী বেশি বেশি দেখা যায়। তেমনি, উল্টো ব্যাপার ঘটে পশ্চিম থেকে পূবের দ্বীপ থেকে দ্বীপে। অস্ট্রেলিয়ার এলাকার বিশেষ ধরনের প্রাণী কাঙারু, কোয়ালা ভালুক, কিউই ক্যাসোয়ারী জাতের পাখি, আর প্লাটিপাস।

দক্ষিণ ও উত্তর আমেরিকার মাঝে দুস্তর বাধা কিছু নেই। তবুও দুটি দেশের উদ্ভিদ আর প্রাণীর মিল বেশি দেখা যায় না। ওয়ালেসের দৃষ্টিতে দুটি দেশ দুটি এলাকা। দক্ষিণ আমেরিকা বা নিওট্রপিক্যাল এলাকা উত্তর আমেরিকা বা নিয়ার্কটিক এলাকা। উত্তর আমেরিকার প্রাণী ও উদ্ভিদের সাথে ইউরেশিয়ার প্রাণী ও উদ্ভিদের মিল রয়েছে। আলস্কা আর সাইবেরিয়ার মাঝে বেরিং প্রণালী এককালে ছিল না। সে পথেই

চলাচল করত এশিয়া ও আমেরিকার প্রাণীরা। [সাথের মানচিত্রে আমেরিকাকে ডানপাশে রেখেছি—দেখ, এশিয়ার সাথে আমেরিকার দূরত্ব কতটুকু!] উত্তর আমেরিকার বাইসন, প্রংহর্ন, র‍্যাটেলস্নেক নামগুলিই আমাদের পরিচিত। সে তুলনায় দক্ষিণ আমেরিকার প্রাণীজগৎ বিচিত্রতর! টুকন, রিয়া, হামিংবার্ড, স্লথ ভালুক, টেপির নামগুলো যেন কতবার শোনা। দক্ষিণ আমেরিকার ওরা বিশেষ প্রাণী।

একবারে নয়, আমি ঠিক করেছি, ধীরে ধীরে ছটি এলাকার সাথে পরিচয় করব।

প্রাণ-অঙ্গ-ভঙ্গিমা

লেখা ও ছবি—উজ্জ্বল চক্রবর্তী

তৃণভোজীদের খুরের খবর নিতে গিয়ে একটা ব্যাপার প্রথমেই আমার চোখে পড়েছে। সেটা হল—খুরের সংখ্যা সবার পায়ে সমান নয়। ঘোড়া, গাধা আর জেব্রার প্রত্যেক পায়ে একটা করে খুর। গরু, মোষ, ভেড়া, হরিণ—এইরকম অনেক জন্তুর পায়ে দুটো খুর। গণ্ডারের পায়ে তিনটে খুর দেখেছি আর হিপোর পায়ে চারটে।

যাদের পায়ে খুরের সংখ্যা এক জোড়া, এবার শুধু তাদের খুর দেখতে লাগলাম। খুরগুলোর নানান-রকম আকৃতি দেখে অবাক না হয়ে পারিনি। দেখলাম, সবার দেহের গড়ন যেমন একরকম নয়—খুরের আকার-আকৃতিও তেমনি আলাদা।

ভেড়ার খুর ছোট—ঘের কম। মোষের খুরের ছড়ানো ঘের—গড়ন অনেকটা গোল। হরিণের খুর ছোটও না আবার গোলও নয়—দুটো খুরই সামনের দিকে সরু, অনেকটা ছুঁচলো ধরণের।

খুরের বৈচিত্র্য এত বেশি যে আমার দেখা এই সবে শুরু। নানান রকম খুরের গড়ন আগে দেখব। তারপর জানতে হবে, কেমন পরিবেশে কোন খুরের সুবিধে কি?

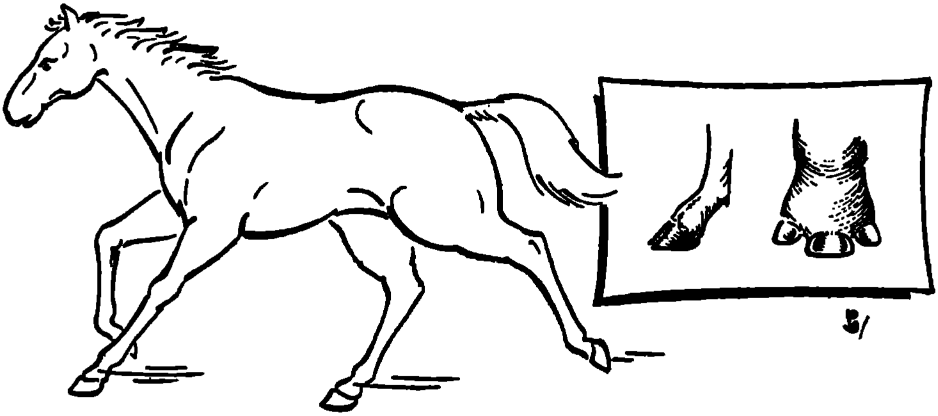

একটি গো-সাপ ও আমি

কুশল মুখোপাধ্যায়

হাজারীবাগে বর্ষায় দুপুর—আমাদের পোষা কুকুরটার চিৎকারে বাইরে বেরিয়ে দেখি সে একটা অদ্ভুত জন্তুকে ধরবার চেষ্টা করছে। জন্তুটার আকৃতি অনেকটা টিকটিকির মত তবে লম্বায় প্রায় তিনফুট। দেখলাম যে শরীরটা টিকটিকি বা কুমীরের মত চার পায়ের মধ্যে ঝোলান নয়, বুক ও পেটটা মাটির থেকে বেশ খানিকটা উপরে, অনেকটা বেড়াল ও কুকুরের মত। বুঝলাম যে ওটা একটা গো-সাপ। সে বোধ হয় বুঝেছিল যে পালাতে গেলেই কুকুর তার ঘাড় কামড়িয়ে ধরবে। তাই সে কুকুরটার দিকে পাশ ফিরে, মুখটা তার দিকে ঘুরিয়ে, লেজ দিয়ে তাকে আঘাত করবার চেষ্টা করছিল। তার হিস্‌হিসানি শুনে ও ফোলান চেহারা দেখে ঘাবড়ে গিয়ে কুকুরটা দূরে দাঁড়িয়ে পড়ল। দুজনেই নড়তে চায়না—তখন সবাই তাকে মারতে এল। অনেক কষ্টে তাদের বোঝান হল যে গো-সাপ বিষাক্ত নয়ই বরং সাপ, ইঁদুর, পোকা খেয়ে মানুষের ভালই করে। কুকুরটাকে সরিয়ে নিতেই সে পালিয়ে গেল। লক্ষ্য করলুম চলবার সময় সে পাটাকে পাশ থেকে ঘুরিয়ে এনে সামনে ফেলে, তাই অদ্ভুত দেখায়।

কিছুদিন পর, বাড়ির পাশেই একটা উইঢিবির গর্তে তাকে ঢুকতে দেখলাম। জায়গাটায় লোকজনের যাতায়াত আছে। তারা ওকে দেখলেই মেরে ফেলবে ভেবে ঠিক করলাম ওকে ধরে জঙ্গলের ধারে ছেড়ে দেব। গর্তের ভেতর তাকে দেখা যাচ্ছিল। একটা লাঠির ডগায় ফাঁস লাগিয়ে পায়ে বা গলায় ফাঁস পরিয়ে বার করবার চেষ্টা করলুম। কিন্তু ফাঁস বাধল লেজে। ঠিক হল হাতে করে টেনে বার করা হবে। গর্তটা খুঁড়ে বড় করে তার লেজের গোড়ার নাগাল পেলাম। লেজ চেপে ধরে প্রাণপণে টানলুম কিন্তু সে চারপায়ে বড় বড় নখ দিয়ে এত জোরে মাটি আঁকড়ে ধরল যে তাকে বের করা গেল না। তখন আস্তে আস্তে হাত এগিয়ে নিয়ে গিয়ে তাকে তার ঘাড় ধরে তুলে আনলুম। দেখলুম গাটা সাপের মত, রঙ ছাইছাই হল্‌দেটে, কয়েক জায়গায় লালচে আর সারা গায়ে কালো কালো ফোঁটা। খাঁচায় করে নিয়ে গিয়ে জঙ্গলে ছাড়তেই সে ছুটে একটা ঝোপের ভেতর লুকোল।

হঠাৎ দেখা

শুভময় চট্টোপাধ্যায়

পরীক্ষার আগের রাত্রে এগারটা নাগাদ বেশ মন দিয়ে পড়ছি হঠাৎ মাথায় কি একটা পোকা এসে বসল। উচ্চিংড়ে ভেবে মাথা ঝাঁকাতেই সেটা টুপ করে টেবিলে পড়ল। ভাল করে তাকিয়ে দেখি—না, উচ্চিংড়ে নয়, একটি দিব্যকান্তি গঙ্গাফড়িং।

চেহারা মন্দ নয়, রং চকচকে হালকা কলাপাতা সবুজ, বপুটি ছিমছাম; হঠাৎ আলোর মধ্যে এসে বোধ হয় একটু থমকে যায়। গুণে দেখি ছটা পা। দুটো পেছন দিকে, সেগুলো বিশাল লম্বা, হাঁটুর কাছে মুড়ে গিয়ে উল্টো V এর মত আকৃতি। বাকি চারটে সামনে, সেগুলো ছোট ছোট। ছুঁচোলো তিনকোনা মুখ শরীর না নাড়িয়ে ওঠানো নামানো যায়, অনেকটা কন্কর্ড বা তু-১৪৪ জেট বিমানের মত। মুখের ডগায় হালকা খয়েরী রঙের দুটি শুঙ্গ বা অ্যান্টেনা, পাতা ও ভুরুহীন কুৎকুতে কালো চোখ।

খানিক পরে দেখি কন্কর্ড মুখের তলার প্রান্তে আরও চারটে পা আছে। সেগুলো অতি ক্ষুদ্র ও রোমশ। অবশ্য অন্যান্য ছটি পায়ের পাতাও রোমশ। মাঝে মাঝে পাগুলো চুলকে নিচ্ছিল। পেটের তলায় দুটো ছোট পালক লক্ষ্য করলাম, পরস্পর সমান্তরাল এবং মাটির দিকে নেমে এসেছে, যেগুলো বাকি শরীরের মত খড়খড়ে নয়, ঢেউয়ের মত নাচান যায়।

অ্যাণ্টেনা দুটো টেবিলের সঙ্গে সমান্তরাল ছিল, 'ঠক্' করে টেবিলে টোকা মারতেই খাড়া। হঠাৎ তিড়িং লাফে টেবিলের কোনায় গিয়ে বসল ও পরমুহূর্তেই উধাও হয়ে গেল। ওইটুকু সময়ের মধ্যেই ঘাড় নীচু করে পেছন থেকে দেখে বুঝলাম একেবারে সাবমেরিন টাইপ চেহারা।

অজয় হোম

তোমাদের জন্যে লিখতে বসে কী লিখব তা ভেবে পাচ্ছি নে। মনটা এত ভারী হয়ে আছে প্রিয়জন-বিয়োগ-ব্যথায় তা আর বলার নয়। বহু ক্লাব ম্যাচের সঙ্গী ছিলাম যেমন, তেমনি নাইট শো'র সিনেমার, এমন কি পারিবারিক অভিনয়াদি ব্যাপারেও। তোমরা অনেকেই তাঁর নাম আজ জানো না, শোনো নি। তোমাদের বাবা কাকা কিংবা ঠাকুরদা-দাদামহাশয়দের খেলার নেশা থাকলে নিশ্চয়ই জানবেন। কিন্তু এক সময় এই শতাব্দীর তিরিশ শতকে তাঁর এবং তাঁর ভাইয়ের নাম ঘরে ঘরে শোনা যেত। সেই দিলখোলা সদাহাস্যময় স্ফূর্তিবাজ সুপুরুষ ক্রিকেটার গণেশ বোস আজ আর ইহজগতে নেই। লিখতে বসে সেই গণেশদার কথা আজ বারবার মনে পড়ছে। কি খেলার মাঠে কি খেলার বাইরে কত শত ছোটোবড়ো ঘটনা চোখের সামনে সিনেমার মতো ভেসে উঠছে।

গণেশদা ছিলেন অল রাউণ্ডার। তাঁর বল করার ভঙ্গিটি ছিল বড়ো মজার। স্লো-মিডিয়াম বল; দৌড়ে বোলিং ক্রিজের স্টাম্পের কাছে এসে একটা ছোট্ট লাফ দিয়ে বল ছাড়তেন। ব্যাটিং ছিল দুর্ধর্ষ। প্রধানত ড্রাইভের উপর ছিল খেলা। সে ড্রাইভের কী যে জোর তা জানতো বিরুদ্ধপক্ষীয় খেলোয়াড়রা। গণেশ ও কার্তিক বোস—দু'ভাইয়ের খেলা দেখতে তখনকার দিনে খোলা মাঠে বেশ ভিড় জমে যেত। সে সময়কার বড়ো বড়ো সাহেবসুবো খেলোয়াড়রাও খোলা মাঠে রোদে দাঁড়িয়ে কলেজ বা ক্লাবের ম্যাচ দেখতো শুধু দু'ভাইয়ের খেলা দেখবে বলে।

গণেশদা ক্রিকেট খেলেছেন সিটি কলেজ, স্পোর্টিং ইউনিয়ন, ইউনিভার্সিটি অকেশনালস্, বেঙ্গল ক্রিকেট ক্লাব ও টাউন ক্লাবে। ট্যুর করেছেন স্পোর্টিং ইউনিয়ন ও ইউনিভার্সিটি অকেশনাল্সের হয়ে সারা ভারতবর্ষে। রঞ্জি ট্রফিতে খেলেছেন তখনকার দিনে সাহেবে ভরা বাংলার দলে। তখন বাৎসরিক

খেলা ছিল পাঞ্জাব বনাম কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের, সেই খেলায় নিসার প্রমুখ ভারতের শ্রেষ্ঠ দ্রুত বোলারদের বিরুদ্ধে গণেশদা খেলেছেন অতি স্বচ্ছন্দে। যে শ্রীলঙ্কা আজ ভারতে ভ্রমণ করছে, সেই তিরিশ দশকে তাদের প্রথম সফরে বেসরকারী টেস্টম্যাচে গণেশ-কার্ত্তিক দুই ভাই ভারতের হয়ে ওপেন করেছেন। সি কে নাইডু ছিলেন অধিনায়ক।

গণেশদার সব কথা লিখতে গেলে গোটা সন্দেশ-এর সব পাতাই ভরে যাবে, তা যেমন সম্ভব নয় তেমনি অন্তরঙ্গ প্রিয়জনের বিয়োগব্যথা অপর কারুর সঙ্গে ভাগ করাও যায় না। হৃদয়ের মণিকোঠায় যতদিন জীবিত থাকব তাঁর স্মৃতি উজ্জ্বল হয়ে থাকবে।

শ্রীলঙ্কা ভারত সফর করছে। ইংল্যাণ্ড ওয়েস্টইণ্ডিজ অস্ট্রেলিয়া প্রভৃতি প্রথম শ্রেণীর দল না হলেও তাঁরা আন্তর্জাতিক টেস্টম্যাচের অন্যতম সরিক হবার চেষ্টা করছেন। গত প্রুডেনশিয়াল কাপে ওয়েস্ট ইণ্ডিজকে যেভাবে বেগ দিয়েছিলেন তাতে সন্দেহ নেই অচিরেই তাঁদের কাম্য টেস্টম্যাচের অন্যতম সরিক হবেন। প্রথম টেস্টম্যাচে হায়দারাবাদে আট উইকেটে হেরে গেলেও তাঁদের ফিল্ডিং সকলেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। সহ-অধিনায়ক ডেভিড হাইনের খেলার জৌলুস না থাকলেও প্রয়োজনে মাটি কামড়ে থাকতে পারেন তা দু'ইনিংসেই প্রমাণ করেছেন। দ্বিতীয় ইনিংসে অধিনায়ক অনুরা তেনেকুন, দলীপ মেনডিস ও টনি ওপাথার খেলা খুবই উপভোগ্য হয়েছিল। যদি তাঁরা আর আধ-ঘণ্টা টিঁকে থাকতে পারতেন তবে এ খেলা ড্র হয়তো হতো। আমার মতে দ্বিতীয় টেস্টম্যাচে উঠতি খেলোয়াড় ভেঙ্গসরকারকে বাদ দেওয়া ঠিক হয় নি। প্রথম বড়ো খেলায় অনেকেই খেলতে পারেন না, তাকে খেলিয়ে খেলিয়ে ঠিক করে নিতে হয়। গাভাসকারের আত্মবিশ্বাস ফিরে পাওয়ার জন্যে একটা বড়ো ইনিংসের দরকার ছিল। সত্যিই তিনি বড়ো ভালো খেলেছেন। বিশ্বনাথ ভালো খেলবেনই।

মনের রঙ্গীন চশমা

চঞ্চল পাল

ধর, তুমি আর তোমার একজন বন্ধু একটা ছবি নিয়ে একসঙ্গে মন দিয়ে দেখছ। এখন আমি যদি প্রশ্ন করি যে, তোমরা দুজন একই জিনিস দেখছ? তোমরা সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দেবে, হ্যাঁ নিশ্চয়ই। কিন্তু মনোবিজ্ঞানীরা বলবেন যে তোমরা দুজন আলাদা জিনিস দেখছ। কথাটা শুনে পাগলামী মনে হচ্ছে তো? কিন্তু কথাটা উড়িয়ে দেবার আগে এসো একটা সহজ পরীক্ষা করে দেখি। তোমরা দুজন আলাদাভাবে কোনোরকম আলোচনা না করে ছবিটাতে যে যে জিনিস যেরকম ভাবে দেখেছ তার হুবহু একটা বর্ণনা দিয়ে দশ বারো লাইন লিখে ফেলো (ছবিটা না দেখে)। এবার তোমার বর্ণনার সঙ্গে তোমার বন্ধুর বর্ণনাটা মিলিয়ে দেখলে আশ্চর্য হয়ে যাবে। শুধু ভাষার দিক দিয়ে নয়, ছবির ভাব ও উপাদানের দিক দিয়ে তোমাদের দুজনের বর্ণনার কত তফাৎ! তুমি হয়ত ছবিটার একটা বিষয়ের ওপর জোর দিয়েছ কিন্তু তোমার বন্ধু হয়ত ওই বিষয়টা প্রায় এড়িয়ে গেছে; তোমরা দুজনে হয়ত বিভিন্ন বিষয়ের ওপর বিভিন্ন ভাব আরোপ করেছ (গভীর, সুন্দর, স্নিগ্ধ, উত্তপ্ত ইত্যাদি)। এমনি আরো কত পার্থক্য চোখে পড়বে।

কিন্তু কেন এমন হয় বলতো? মনোবিজ্ঞানীরা বলছেন যে, যখন আমরা কোন জিনিস দেখি তখন তার একটা হুবহু ফটোগ্রাফ মনের ভেতর তুলি না, বরং জিনিসটার উপাদানগুলো আমাদের নিজেদের মত করে মনের ভেতর সাজিয়ে নিই বা নিজেদের মনের মত একটা অর্থ আরোপ করি। একে মনোবিজ্ঞানের ভাষায় বলে পারসেপ্‌শন্‌ বা প্রত্যক্ষ। প্রত্যক্ষ আবার অনেক কিছুর ওপর নির্ভর করে। মোটামুটিভাবে বলা যায় যে, আমরা যে যেরকম লোক তার ওপর প্রত্যক্ষ প্রধানতঃ নির্ভর করে; যেমন, আমাদের পূর্ব অভিজ্ঞতা, চরিত্র, প্রত্যাশা ও চাহিদা, জন্মগত ও অর্জিত সংস্কার, পারিপার্শ্বিক অবস্থা মানসিক প্রস্তুতি ইত্যাদি! পুরো তালিকা ও তার ব্যাখ্যা দিতে গেলে পাতার পর পাতা শেষ হয়ে যাবে। এখন মূল কারণটা মোটামুটিভাবে সহজ কথায় জেনে গেছ তো? কিছু দিন বাদেই যে কোন মনোবিজ্ঞানের বই ঘেঁটে সব জেনে ফেলবে, তখন আর আশ্চর্য লাগবে না।

আরও একটা মজার পরীক্ষা একটু ঘুরিয়ে করতে পারলে ফলাফল আরও মজার হবে। তুমি যে কোন একটা ঘটনার বিষয়ে দশ-বারো লাইন লিখে ফেলো। এবার তোমার লেখাটা তোমার এক বন্ধুকে (ধর মণ্টু) পড়ে শোনাও আর শোনা ঘটনাটা যতটা সম্ভব হুবহু লিখতে বলো মণ্টুকে। তারপর মণ্টুকে তার লেখাটা আর এক বন্ধুকে (ধর রুমকি) পড়ে শোনাতে বল আর একই ভাবে রুমকিকে শোনা ঘটনাটা হুবহু লিখতে বলো। এইভাবে পাঁচ-ছজন বন্ধুকে নিয়ে পরীক্ষাটা চালাও। এবার শেষ বন্ধুটির বর্ণনার সঙ্গে তোমার বর্ণনাটা মিলিয়ে দেখ কত তফাৎ। দেখবে কত কথা বাদ চলে গেছে, কত কথা নতুন যোগ হয়েছে (ঘটনা ও ভাব দুইই), যদি অনেক জনকে নিয়ে পরীক্ষাটা করতে পার তাহলে দেখবে হয়ত কতো উদোর পিণ্ডি বুধোর ঘাড়ে এসে চেপেছে।

গুজব যখন ছড়ায় তখন এইভাবেই ছড়ায়। একটা ঘটনা অনেক লোকের মারফৎ বিকৃত ও পরিবর্তিত হতে হতে এমন একটা পর্যায়ে এসে দাঁড়ায় যার বেশীর ভাগটাই হয়ত মিথ্যা। সবাই যে মিথ্যা কথা বলছে এমন ভাববার কোন কারণ নেই। আসলে আমরা যা শুনেছি তা নিজেদের মত করে গুছিয়ে নিয়ে, অর্থ আরোপ করে নিয়ে শুনছি আর তা বলছি, অর্থাৎ দোষ সেই প্রত্যক্ষের।

সুতরাং এখন যদি আমি বলি যে আমাদের সকলের মনে বিভিন্ন রঙীন কাচের চশমা আছে যার ভেতর দিয়ে আমরা একটা জিনিস প্রত্যেকে আলাদা রঙে প্রত্যক্ষ করছি তাহলে কি কিছু ভুল বলা হবে? অবশ্য এই চশমার কাজকর্ম অর্থাৎ প্রত্যক্ষের প্রক্রিয়াটা আমাদের অজান্তেই ঘটে ঠিক যেমন দেহে খাদ্য হজম করা বা রক্ত চলাচল প্রক্রিয়াতে আমাদের সক্রিয় কোন ভূমিকা নেই।

জানো কি?

বিজাপুরের 'গোলগম্বুজ' সবচেয়ে বড়ো গম্বুজ তা' তোমরা শুনে থাকবে। সেটির উচ্চতা মাটি থেকে ১৯৮ ফুট ও ব্যাস ১২৪ ফুট। মহম্মদ আদিল শাহ (১৬২৬-১৬৫৬ খ্রী:) এটি তৈরি করিয়েছিলেন। ওপরে ওঠার জন্য প্রত্যেক কোণে সিঁড়ি আছে, সেই সিঁড়ির সাহায্যে 'হুইসপারিং গ্যালারি'তে উঠতে পারা যায়। নিচে দাঁড়িয়ে দেয়ালের একটা বিশেষ জায়গায় চুপি চুপি কোনো কথা বললে তার উল্টো দিকে ১২৪ ফুট দূরে সেই বারান্দায় কথাগুলি স্পষ্ট শোনা যায়। এই ধরনের 'চুপি-চুপি কথা শোনার বারান্দা' আর একটি আছে ঐতিহাসিক গোলকুণ্ডা দুর্গে। দুর্গে ঢোকবার মুখে এক জায়গায় খুব আস্তে আস্তে হাততালি দিলে সেই শব্দ দুর্গের উপরে এক জায়গায় স্পষ্ট শোনা যায়, যেখানে উঠতে আধঘণ্টা সময় লাগে। ঐ-ভাবে হাততালি দিয়ে দিয়ে সুলতানের গুপ্তচরেরা সাঙ্কেতিক ভাষায় তাদের প্রভুকে বিপদের অর্থাৎ আসন্ন শত্রু আক্রমণের খবর জানাত। কয়েকবার কিভাবে হাততালি দিলে তার কি অর্থ হয় সুলতান বুঝতেন, তার জন্য প্রস্তুত হতেন শত্রু আসবার আধঘণ্টা আগেই। রাজ-সভা ষড়যন্ত্র, বিদেশী শত্রুর আগমন যেমন তিনি জানতে পেরে সতর্ক হতে পারতেন, তেমনি বন্ধু, আত্মীয় বা মাননীয় অতিথিকে অভ্যর্থনা করবার জন্যও আগেই প্রস্তুত হতে পারতেন, হঠাৎ গিয়ে কেউ তাঁকে অপ্রস্তুত করতে পারত না। বর্তমান বিজ্ঞানীরা না কি এই রহস্যের কোনও কিনারা করতে পারেননি আজ পর্যন্ত।

ইতিহাসে পলাতক

সোভিয়েট রুশিয়ার বৈমানিক লেফটেন্যান্ট মাইকেল দেভিয়াতাইয়েফ জার্মানদের হাতে বন্দী হয়েছিলেন ১৯৪৫ খৃষ্টাব্দের ৮ই ফেব্রুয়ারী। প্রুশিয়ার পূর্ব সীমান্তে তাঁর বিমানকে ভূপাতিত করে জার্মানরা তাঁকে বন্দী করেছিল। দেভিয়াতাইয়েফ কয়েকবার বন্দীশালা থেকে পালাতে চেষ্টা করে ব্যর্থ হলেন। 'শুইনেমুণ্ড' নামে যে বন্দীশালাতে দুর্দান্ত বন্দীদের রাখার ব্যবস্থা ছিল, সেইখানে তখন দেভিয়াতাইয়েফকে জার্মানরা পাঠিয়ে দিল …

হঠাৎ প্রহরীদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল বন্দীর দল…
অতর্কিতে আক্রান্ত হয়ে জার্মান প্রহরীরা হাতের অস্ত্র ব্যবহারের সুযোগ পেল না। তারা পরাজিত হল। এর মধ্যে দেভিয়াতাইয়েফ চটপট দেখে নিলেন বিমানটিতে যথেষ্ট তেল মজুত আছে…
শত্রু-বিমানটিকে অধিকার করে পলাতকরা তৎক্ষণাৎ আকাশপথে যাত্রা করলেন। তলা থেকে বিমান-বিধ্বংসী কামান চালিয়েও বিমানটিকে ঘায়েল করতে পারল না জার্মানরা — তখন একটি 'ফাইটার' বিমান উপরে উঠে পলাতক বিমানকে আক্রমণ করল … কিন্তু একটু পরেই পলাতকদের বিমান থেকে নিক্ষিপ্ত গুলিতে বিদ্ধ হয়ে আক্রমণকারী বিমানটি ধ্বংস হয়ে গেল…
৪
ঘন্টা তিনেকের মধ্যেই তেল ফুরিয়ে গেল। বিমানটিকে তাড়াতাড়ি রুশ এলাকার মধ্যে একটা মাঠের উপর নামিয়ে ফেলা হল। রুশ সৈনিকরা ছুটে এসে সবিস্ময়ে দেখল জার্মান বিমানের ভিতর থেকে বেরিয়ে আসছে তাদেরই দলের মানুষ!

নিউসক্রিপ্টের কিশোর সাহিত্য

প্রত্যেকটি বই সুনির্বাচিত—নিঃসঙ্কোচে ছোটদের হাতে তুলে দেবার মত

বৎসরের শ্রেষ্ঠ পুস্তক হিসাবে ভারত সরকার কর্তৃক পুরস্কৃত

সত্যজিৎ রায়—প্রোফেসর শঙ্কু ৭·০০
লীলা মজুমদার—উপেন্দ্রকিশোর ৫·০০

১৩৭৮-৭৯এ শিশুসাহিত্য পরিষদ কর্তৃক পুরস্কৃত

সবিতা ঘোষ—পুব হতে কোন পশ্চিমে ৪·০০

পুণ্যলতা চক্রবর্তী—ছোট্ট ছোট্ট গল্প ৮·০০
ছেলেবেলার দিনগুলি ৫·০০
লীলা মজুমদার—মাকু ৪·৫০
হাস্য ও রহস্যের গল্প ৪·০০
নলিনী দাশ—হাস্য ও রহস্যের গল্প ৪·০০
অপর্ণা দেবী—দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন ৩·০০
শিবরাম চক্রবর্তী—
কেরামতের কেরামতি ২·৫০

অনুবাদ সাহিত্য

কুলদারঞ্জনের রায়—জুলভার্ণের রহস্যময় চিরন্তন 'দ্বীপের রহস্য' The mysterious Island বা আশ্চর্য দ্বীপ।
দ্বিতীয় খণ্ড ৬·০০

বাণী রায়—বিশ্ববিখ্যাত লুইস আলকটের little women এর অসংক্ষেপিত অনুবাদ
কিশোরী কন্যা— ৮·০০

নিউস্ক্রিপ্ট—এ-১৪, কলেজ স্ট্রীট মার্কেট

সন্দেশের গ্রাহকেরা বিশেষ কমিশন পাবে

গ্রাহকদের লেখা চিঠি

প্রিয় গ্রাহক-গ্রাহিকা ও পাঠক-পাঠিকা ভাইবোন,

গতবছরের মতো এবারও 'ইচিংকা'র পক্ষ থেকে বসে-আঁকো প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হচ্ছে। আগামী ১১ই জানুয়ারী অনুষ্ঠিত হবে সিংহী-হাউসে। এবারও বিচারক থাকছেন সম্পাদক মশাই, সত্যজিৎ রায়। বয়স অনুসারে, বিভাগ দুটি। বিস্তারিতভাবে জানান হবে আগামী সংখ্যায়। ২০শে ডিসেম্বরের পর থেকেই সন্দেশ কার্যালয় থেকে পাওয়া যাবে। প্রবেশ মূল্য তিন টাকা। সবাই যোগ দিও, কেমন!

নুপুর গুপ্ত, ১৩৯/১৫ই বছর
ও
আরও অনেক সন্দেশের গ্রাহক গ্রাহিকা।

★ 'বলব কি ভাই হুগলী গেলুম,
বলছি তোদের চুপিচুপি,
দেখতে পেলুম তিনটে শুয়োর
মাথায় তাদের নেইক টুপি !' ★

তারপর ?

?

ক—১

একটি তাদের বাচ্চা নেহাৎ,
অন্য দুজন বুড়ো ধাড়ি,
পায়ে হেঁটেই খাচ্ছে হাওয়া,
নেইকো তাদের হাওয়া গাড়ি।

১৮১৬ কৌশিক মুখোপাধ্যায়

খ—১

কিন্তু তাদের 'পৃষ্ঠে আসীন,'
তিনটে রোগা হ্যাংলা হিপি।
শালের পাতায় ফুচকা ওড়ায়,
মাথায় দিয়ে তেলের কুপী।

১৩৮১ নীলাঞ্জন চট্টোপাধ্যায়

?

ক—২

শুনতে পেলুম হালুম হুলুম,
চমকে তখন ঘোরে মাথা,
দেখতে পেলুম তিনটে মানুষ
নিবাস তাদের কলিকাতা॥

১৮১৭ প্রবীর মুখোপাধ্যায়

খ—২

তিনটে টুপি ভর্তি ছিল
ছারপোকা আর উকুন ছানা,
কামড় খেয়ে কাতর তারা
টুপি ফেলে ছুটল থানা।

৭৫৯ কৃষ্ণা সরকার

খ—২

★ 'বল্ দেখি ভাই কেমন করে
ঘটতে পারে এমন ধারা
সভ্য হবার প্রথম পাঠও
নেয়নি কি হায় আজও তারা ?' ★

৯৭৯ অলকানন্দ গুহ

সন্দেশ-এর নিয়মাবলী

(১) সন্দেশের বার্ষিক সডাক মূল্য ১৭'০০, প্রথম ও দ্বিতীয় ছয়মাস যথাক্রমে ১০'০০ এবং ৭'০০। পূজা সংখ্যা রেজিঃ ডাকে যাবে।

(২) শারদীয়া সংখ্যা হাতে নিলে যথাক্রমে ১৬'০০, ৯'০০ ও ৭'০০, সব কটি সংখ্যা হাতে নিলে ১৫'০০, ৮'৫০ এবং ৬'৫০।

(৩) প্রতি সাধারণ সংখ্যার মূল্য ১'৫০, শারদীয়া সংখ্যা (আনুমানিক) ৬'০০।

(৪) যে কোন সময়ে চাঁদা দিয়ে বৈশাখ (এপ্রিল) অথবা কার্তিক (অক্টোবর) থেকে ছয়মাস বা এক বছরের জন্য গ্রাহক হওয়া যায়।

(৫) প্রতি বাংলা মাসের মাঝামাঝি বা ইংরাজি মাসের শেষে সন্দেশ প্রকাশিত হবে।

(৬) পরবর্তী ইংরাজি মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহেও সন্দেশ না পেলে এবং লিখিতভাবে জানালে, ডুপ্লিকেট কপি পাঠানো হবে। জেলা স্কুলবোর্ডের স্কুলগুলি লিখবেন পরবর্তী ইংরেজি মাসের শেষে।

(৭) যথাসময়ে অপ্রাপ্তিসংবাদ না জানালে ডুপ্লিকেট দেওয়া সম্ভব নাও হতে পারে। তবে অবশিষ্ট থাকলে, এবং ডাক খরচ ২৫ পয়সা পাঠালে, অথবা নিজে এসে নিয়ে গেলে, দেওয়া হবে।

(৮) সন্দেশের চাঁদা মনিঅর্ডার, নগদ অথবা চেকে পাঠান যায়।

(৯) চেকে টাকা পাঠালে, Sandesh নামে চেক লিখবেন।

(১০) মফঃস্বল ব্যাঙ্কের উপর চেক দিলে ভাঙাবার খরচ অতিরিক্ত ২ টাকা লাগবে।

(১১) সন্দেশের জন্য সমস্ত রচনা ও চিঠিপত্র সম্পাদকের নামে নিম্নলিখিত ঠিকানায় পাঠাতে হবে।

(১২) গ্রাহক-গ্রাহিকারা রচনা ধাঁধা প্রতিযোগিতার উত্তর ইত্যাদি পাঠাবার সময়ে গ্রাহক-নম্বর, নাম ঠিকানা ও বয়স স্পষ্ট করে লিখবে। সন্দেশ পাঠাবার সময়ে গ্রাহকের নামের বাঁপাশে গ্রাহক-সংখ্যা লিখে দেওয়া হয়। নিজের নাম ঠিকানা-লেখা পোস্টকার্ড পাঠালে কার্যালয় থেকেও জানান হয়। যে কোন প্রশ্নের উত্তর তাড়াতাড়ি চাইলে জোড়া পোস্টকার্ড লিখতে হবে। গ্রাহক, স্কুল/ক্লাবের প্রতি ছাত্রই গ্রাহক।

(১৩) স্কুল, ক্লাব, লাইব্রেরিরা চিঠিপত্র ও ব্যক্তিগত যোগাযোগের সময়ে নিজ নিজ গ্রাহক সংখ্যা অবশ্যই ব্যবহার করবেন। যাঁরা সার্কল মারফত সন্দেশ পান,সার্কলের এবং জেলার নাম দেবেন। ব্যক্তিগত উত্তর চাইলে জোড়া পোস্টকার্ড ব্যবহার করবেন। গ্রাহক স্কুল/ক্লাব/লাইবেরির ছাত্র/সভ্যরা সব বিভাগে যোগ দিতে পারে।

(১৪) লেখকেরা ফলাফল জানবার জন্য লেখার সঙ্গে স্বনামাঙ্কিত পোস্টকার্ড দেবেন, লেখা ফেরত চাইলে উপযুক্ত টিকিটযুক্ত খাম দেবেন (আলগা টিকিট দেবেন না)। পরে কোন সময়ে লেখা সম্বন্ধে জানতে চাইলে জোড়া পোস্টকার্ড লিখবেন। লেখাটি কোন মাসে দেওয়া হয়েছিল সঠিক না জানালে ফলাফল বলা সম্ভব নয়।

(১৫) পাঁচ কপির কমে এজেন্সী দেওয়া হয় না। শতকরা দশ কপি পর্যন্ত ফেরত নেওয়া হবে। আমরা নিজ খরচে এজেন্টের নিকট পত্রিকা পাঠাব, কিন্তু ফেরত দেবার ডাক খরচ এজেন্টকে দিতে হবে।

(১৬) বাংলা মাসের ২০ তারিখের মধ্যে পরবর্তী মাসের বিজ্ঞাপনের পাণ্ডুলিপি ও ব্লক বিজ্ঞাপনদাতারা সন্দেশ কার্যালয়ে পাঠিয়ে দেবেন।

সন্দেশ কার্যালয়
১৭২/৩, রাসবিহারী অ্যাভিনিউ
কলিকাতা-২৯
(ত্রিকোণ পার্কের দক্ষিণে)
ফোন—৪৬-৪১১১

'নিউস্ক্রিপ্ট'
এ-১৪, কলেজ স্ট্রিট মার্কেট
কলিকাতা-১২

★ মনে-রাখার-মত প্রতিযোগিতা ★

একবার কি হয়েছিল জানো ?···না, না, থাক, আমার সেই ঘটনার কথা আর একদিন বলব।

তোমাদের প্রত্যেকের জীবনের সব চেয়ে মনে রাখার মত ঘটনার কথা তোমরা লিখে জানাও তো, দেখি কারটা কত ভালো হয়।

নিয়মাবলী

১। নিজেদের কোন সত্যি অভিজ্ঞতার কথা লিখবে, বানানো ঘটনা চলবে না।
২। ৩০০ শব্দের মধ্যে রচনা শেষ করতে হবে।
৩। সতের বছরের কম বয়স্ক সব গ্রাহকই যোগ দিতে পারবে।
৪। গ্রাহক স্কুল/ক্লাব/লাইব্রেরির ছাত্র/মেম্বাররাও ব্যক্তিগত ভাবে যোগ দিতে পারে।
৫। নাম, ঠিকানা, বয়স ও গ্রাহক নম্বর স্পষ্ট করে লিখবে। যে সব স্কুলের গ্রাহক নম্বর নেই তারা স্কুলের সার্কেলের আর জেলার নাম লিখবে।
৬। যারা গ্রাহক নয় তারাও ১৫ই জানুয়ারির মধ্যে গ্রাহক হলে যোগ দিতে পারবে। যারা নম্বর পায়নি, তারাও 'নতুন' লিখে যোগ দেবে।
৭। ১৫ই জানুয়ারি ১৯৭৬এর মধ্যে উত্তর আমাদের হাতে পৌঁছান চাই।
৮। প্রতিযোগিতায় চারটি পুরস্কার থাকবে।
ক বিভাগে—যাদের বয়স ১২র কম—১ম ১০৲, এবং ২য় ৫৲।
খ বিভাগে—বয়স ১২ বা তার বেশি কিন্তু ১৭র কম—১ম ১০৲ এবং ২য় ৫৲।

★ জোড়া প্রতিযোগিতার ফলাফল ★

তারপর ?

ক-বিভাগ—১ম—১৮১৬ কৌশিক মুখোপাধ্যায়
২য়—১৮১৭ প্রবীর মুখোপাধ্যায়

খ-বিভাগ—১ম—১৩৮১ নীলাঞ্জন চট্টোপাধ্যায়
২য়—৭৫৯ কৃষ্ণা সরকার ও ৯৭৯ অলকানন্দা গুহ (ভাগাভাগি করে)

এদের লেখাও ভাল হয়েছে—

ক-বিভাগ—১২৩৮ নিবেদিতা নস্কর, ১৭৮১ শ্রীলা সেন।

খ বিভাগ—২৯৫ শ্রেয়া দত্ত, ১১০৪ রঞ্জিনী মুখোপাধ্যায়, ১৫৬৪ অনিন্দ্য মজুমদার, ১৬১৫ পথিকৃৎ বন্দ্যোপাধ্যায়, ১৭৯২ মল্লিকা পাল।

বুড়ো পণ্ডিতদের ছবি

ক-বিভাগ—১ম—৬৮৫ ঋতুপর্ণা বন্দ্যোপাধ্যায়, ২য়—১২০২ সোনালী বেগম

খ-বিভাগ—১ম—১৬৫৫ শৃণ্বন্তী পাল, ২য়···২৯৫ শ্রেয়া দত্ত।

এদের ছবিও ভালো হয়েছে—

ক বিভাগ—১০৩৬ উদয়ন মিত্র, ১৩৬১ ইন্দ্রাণী দাশগুপ্ত

খ-বিভাগ—৩৬৬ সন্দীপ বসু, ১০৯৫ কৌশিক মুখোপাধ্যায়, ১১০৪ রঞ্জিনী মুখোপাধ্যায়, ২৪২০ গায়ত্রী দত্ত।

কালিকা প্রেস প্রাইভেট লিমিটেড, ২৫ ডি. এল্. রায় স্ট্রীট, কলিকাতা-৬ হইতে মুদ্রিত
সন্দেশ কার্যালয় : ১৭২/৩, রাসবিহারী অ্যাভিনিউ, কলিকাতা—২৯
অশোকানন্দ দাশ কর্তৃক প্রকাশিত।